পা দাবাইতে লাগিল। কালেক্টর সাহেব নিষেধ করিলেন এবং বলিলেনঃ মতলব কি? তাই বল। কিন্তু সে ছাড়িল না, দাবাইতেই রহিল। অবশেষে যখন তিনি বহুবার নিষেধ করিলেন এবং বার বার মতলব জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে বলিলঃ আমি আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, 'মউরূসী' কাহাকে বলে? তিনি বলিলেনঃ "কোন পাটওয়ারীর নিকট জিজ্ঞাসা কর।" সে বলিলঃ 'না, আমি আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করিতেছি।' কেহ এরূপ বলে, কেহ ওরূপ বলে, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয় না। কালেক্টর বলিলেনঃ ১২ (বার) বৎসরের দখলী স্বত্বকে 'মউরূসী' বলে। 'মউরূসী' হক জন্মিলে জমিদার কোন কৃষককে উচ্ছেদ করিয়া অপর কৃষক বসাইতে পারে না। সে বলিলঃ তবে তো সর্বনাশ। 'শামেলী' তহসীলে আপনার তহ্‌সীলদার এগার বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে। আর এক বৎসর অতীত হইলেই তো উক্ত তহ্‌সীল তাহার মউরূসী স্বত্ব হইয়া পড়িবে। অতঃপর আপনার বাবাও তাহাকে তাড়াইতে পারিবে না, আমার বাবাও না। মোটকথা, সে এমন মজার সহিত ব্যক্ত করিল যে, কালেক্টর সাহেব তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন। এই ব্যক্তি উক্ত তহ্‌সীলদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে। তিনি অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত তহ্‌সীলদারকে সেই তহ্‌সীল হইতে বদলী করিয়া দিলেন।

দেখুন, দুনিয়ার কোন হাকীম স্বেচ্ছায় নিজ পদে স্থায়ী থাকিতে পারে না; বরং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাহাকে বদলী বা বরখাস্ত করিয়া দিতে পারে। তহসীল তো অতি নিম্নস্তরের অফিস, তাহাতেও কাহারও চিরস্থায়ী স্বত্ব হইতে পারে না। অথচ বেহেশ্‌ত যাবতীয় নেয়ামতের সেরা। যাহার প্রতিশ্রুতিতে মুমেনের অন্তর প্রফুল্ল হয়, শরীরে শক্তি আসে, এমন বড় নেয়ামতের উপর আমাদের চিরস্থায়ী স্বত্ব হইয়া যাইবে। স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাও (নাউযুবিল্লাহ্‌) উহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। কেমন বিস্ময়ের কথা। সুতরাং মানুষের জন্য পারলৌকিক স্থায়িত্ব সাব্যস্ত থাকিলেও তাহা কখনও আল্লাহ্‌ তা'আলার স্থায়িত্বের সমকক্ষ নহে; বরং উভয় স্থায়িত্বের মধ্যে প্রকারভেদ রহিয়াছে। অতএব, এই শিরক হইতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য "তোমার প্রভুর ইচ্ছাধীন" সংযোগ করা হইয়াছে। অতএব, দেখুন, স্থায়িত্ব আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ, মানুষও এক অর্থে এই গুণের অধিকারী। তথাপি উভয় স্থায়িত্বের মধ্যে এমন পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাতে একটি অপরটি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, মানুষের স্থায়িত্ব ত্রুটিপূর্ণ।

যখন উভয় গুণের মধ্যে এরূপ পার্থক্য বিদ্যমান, তখন মানবের গুণ উপলব্ধি করিলে তাহাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণের উপলব্ধি অনিবার্য হয় না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। কোন জগতেই আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার এবং গুণাবলীর তথ্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। বিবেকানুযায়ীও অসম্ভব এবং দলিল অনুযায়ীও নিষিদ্ধ। সর্বকালের জ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ ইহাতে একমত হইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার তথ্য অবগত হওয়া বিবেকানুযায়ী অসম্ভব। কিতাবী দলিল হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে, পরলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার। সেদিন সেই মহান সত্তার জ্যোতির্ময় চেহারা হইতে সর্বপ্রকারের পর্দা ও বাধা উঠিয়া যাইবে এবং পিপাসাতুরগণ দীদার লাভ করিয়া তৃপ্ত হইবে। وَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِهٖ حِجَابٌ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ 'কিবরিয়া' অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠত্ববোধের পর্দা নামক একটি পর্দা তখনও অবশিষ্ট থাকিবে। তাহা উঠিবার আশা নাই। কেননা, অনাদি-অনন্ত সত্তার রহস্যই সেখানে। অনাদি-অনন্ত সত্তা কখনও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। এই কারণেই আমি বলিয়াছি, সেই পর্দা উঠিবেও না, উঠিবার আশাও নাই। তাঁহার এই অনাদি-অনন্ত গুণই বিশিষ্টতম গুণ। এই গুণ তিনি ছাড়া অন্য কাহারও নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ হইল। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার স্থায়িত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ শুধু অপরিহার্যতা এবং অনাদি-অনন্ত গুণকে আল্লাহ্র জন্য খাছ মনে করেন। আর কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব এবং দেহহীন অস্তিত্বকে গায়রুল্লাহ্র জন্যও স্বীকার করেন। দার্শনিকগণ এসব গুণকে শুধু আল্লাহ্র খাছ গুণ বলিয়া থাকেন। এই কারণেই দেহহীন অস্তিত্বের প্রবক্তাদের দার্শনিকগণ কাফের মনে করেন। আর তত্ত্ববিদগণ সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্যতা ও অনাদি-অনন্ত এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব—এই তিনটিকে আল্লাহ্র খাছ গুণ বলেন, আর দেহহীন অস্তিত্ব অন্যের জন্যও সাব্যস্ত করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, অস্থায়ী কতক পদার্থ আছে যাহা কালের প্রেক্ষিতে অস্থায়ী এবং সৃষ্ট। ইহাদিগকে তাহারা لطائف (লাতায়েফ) অর্থাৎ, সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'রূহ' ইহারই অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা ইহাকে সৃষ্ট ও অস্থায়ী এবং দেহহীন অস্তিত্বও বলেন। সুতরাং তাহারা মানবদেহ সৃষ্টির পূর্ব হইতেই ইহার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা এই দেহহীন অস্তিত্বের কারণেই রূহ্কে স্থানের মুখাপেক্ষী মনে করেন না, রূহ্ লা-মকানে অবস্থান করে বলিয়া মন্তব্য করেন। তত্ত্ববিদগণের এই মন্তব্য হইতেই সুফিয়ায়ে কেরাম মূলবিহীন সূক্ষ্ম পদার্থের স্থান আরশের উপরে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, উহা আরশের উপরিভাগে অবস্থান করে; বরং যত প্রকারের স্থান দলিল দ্বারা প্রমাণিত, তন্মধ্যে আরশ সকলের উচ্চে শেষ সীমা—উহার উপরে স্থান বলিতে কিছু নাই। অতএব, আরশের উপর বলিতে লা-মকানই উদ্দেশ্য। আর সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পদার্থ যেহেতু দেহহীন অস্তিত্ব এবং স্থানের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং 'আরশের উপর' বলিতে স্থানের মুখাপেক্ষীবিহীনতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহারা সে সমস্ত লোককে কাফের মনে করেন না, যাহারা বলেঃ "এমন পদার্থও আছে যাহা দেহহীন অস্তিত্ব, কিন্তু সৃষ্ট ও অস্থায়ী। অবশ্য যাহারা সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্যতা ও আদি-অন্তহীনতা এবং কালের প্রেক্ষিতে স্থায়িত্ব গুণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য সাব্যস্ত করে, সূফিয়ায়ে কেরাম তাহাদিগকে কাফের মনে করেন। কেননা, এগুলি আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্টতম গুণ। অস্তিত্ব অপরিহার্যতার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার উপলব্ধি অসম্ভব। এই গুণ হইতে তিনি কোন সময়ই শূন্য নহেন। কাজেই পরলোকেও তাঁহার সত্তার গুণাবলী উপলব্ধি সম্ভব নহে। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেনঃ অদৃষ্ট বিধানের রুদ্ধদ্বার ইহজগতের ন্যায় পরলোকেও মুক্ত হইবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়ার উপরই অদৃষ্ট বিধানের তথ্য নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়া ইহলোকেও সম্ভব নহে। সুতরাং ইহার উপর নির্ভরশীল বস্তু সম্বন্ধে অবগত হওয়া উভয়লোকে অসম্ভব। সুতরাং এমন বিজ্ঞ আলেমগণ যখন নিজের শক্তিকে খর্ব ও অপারক মনে করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন যে, আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর তথ্য অবগত হওয়া অসাধ্য, তবে এখন আমাদের ন্যায় মূর্খ লোকের পক্ষে এসমস্ত বিষয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাওয়া বেআদবী এবং সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে; বরং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কেরামের নির্দেশের বিপরীত। এসমস্ত বিষয়ে খোদাদত্ত আন্তরিক জ্ঞানের উপর ক্ষান্ত থাকিয়া আমলের চেষ্টায় লাগিয়া যাওয়া উচিত। ইহাই আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করিতেছিলাম, বাক্য পরম্পরায় উহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে।

বলিতেছিলাম, যে সমস্ত বিষয়ে মূলত কেবল জ্ঞান-বিশ্বাসই উদ্দেশ্য, সে সমস্ত বিষয়েও কেবল জ্ঞানলাভই উদ্দেশ্য নহে; বরং তদনুযায়ী আমল করাও উদ্দেশ্য এবং لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ আয়াতে আমার সেই উক্তির পোষকতা রহিয়াছে। সুতরাং يَنْزِلُ رَبُّنَا হাদীসে যেমন

আল্লাহ্‌ তা'আলা আসমানে নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য, তদ্রূপ রাত্রি জাগিয়া নফল এবাদত করার প্রতি উৎসাহ প্রদানও উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, শুধু এতদসম্পর্কিত জ্ঞানলাভকেই হিতকর মনে করিয়া يَنْزِلُ وَيَحْيِى প্রভৃতি গুণাবলীর অনুসন্ধানের পশ্চাতে লাগিয়াছি। অথচ যাহা হাদীসের প্রকৃত উদ্দেশ্য উহা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি।

এইরূপে وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا আয়াতটিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শুধু আখেরাত সম্বন্ধে জ্ঞান-বিশ্বাস প্রদানই এই আয়াতের উদ্দেশ্য নহে; বরং আমলের ক্ষেত্রে উহার দ্বারা কাজ লওয়াও উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি যেমন আমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে, তদ্রূপ উহার অস্থায়িত্বকে স্মরণ পথে উদিত রাখিয়া দুনিয়ার প্রতি মনে বিরাগ উৎপন্ন করা উচিত। ইহাই এতদসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হইবে, যখন সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার প্রতি বিরাগও উৎপন্ন হয়, দুনিয়ার অস্থায়িত্বের কথা সর্বদা মনে উপস্থিতও থাকে। তাহাতেই উক্ত বিশ্বাসের উদ্দেশ্য সফল হইবে। অন্যথায় এই জ্ঞানলাভ ও বিশ্বাস স্থাপনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। আলোচ্য আয়াতের এবারত এই বিষয়টিকে কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছে।

এমন নহে যে, কোন প্রকার কষ্ট বা টানাহেঁচড়া করিয়া কিংবা দুর্বোধ্য ব্যাখ্যার সাহায্যে এ সমস্ত বিষয়বস্তু বাহির করিতে হইয়াছে; বরং এই বিষয়গুলি এই আয়াত হইতে এমনিভাবে বাহির করা হইয়াছে যেমন কূপ হইতে পানি। কূপে পানি ছিল বলিয়াই বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। তদ্রূপ এই বিষয়গুলিও আয়াতের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়াই বাহির করা সম্ভব হইয়াছে। না থাকিলে কোথা হইতে বাহির হইত?

কোরআনে করীম তাজাল্লীবিশেষঃ প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়গুলি এই সংক্ষিপ্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত অসংখ্য বিষয়বস্তুর একটি অংশমাত্র। কোন মানুষের শক্তি নাই যে, সে কোরআনে পাকের এত ব্যাখ্যা করে, যাহার পরে উক্ত আয়াতের মধ্যে আর কোন মাস্‌আলা অবশিষ্ট না থাকে। কোরআন শরীফের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তুসমূহ শেষ হইবার নহে। ইহাই তো কালামুল্লাহ্‌র 'অক্ষমকারী গুণ', যাহা সমগ্র জগতকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী।

چیست قرآں اے کلام حق شناس   رو نمائے رب ناس آمد بناس
حرف حرفش راست در بر معنی   معنے در معنے در معنے

"কোরআন শরীফ কি? ইহা একটি আয়না। যাহাতে মানুষ খোদার চেহারা দেখিতে পায়। ইহার এক একটি হরফ হাকীকত এবং মারেফাতের ভাণ্ডার।" অর্থাৎ, কোরআন শরীফ একক খোদাকে দর্শন করিবার একটি আয়না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিবার সিঁড়ি বা ধাপ। কোরআনের প্রদর্শিত সড়ক ধরিলে মানুষের আর পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। প্রকৃত উদ্দিষ্ট স্থানে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সে পৌঁছিয়া যাইবেই। কেননা, কোরআন শরীফ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার তাজাল্লীসমূহের মধ্যে একটি তাজাল্লীবিশেষ। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার তাজাল্লীকে পথপ্রদর্শক স্থির করিয়া লইবে, সে ব্যক্তি খোদা তা'আলার দরবার পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছিয়া যাইবে। যদিও ইসলামী দার্শনিকগণ এই কোরআনকে স্বর ও বর্ণ দ্বারা গঠিত কালাম

বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্বর ও শব্দবিশিষ্ট হওয়া তাজাল্লী হওয়ার পরিপন্থী নহে। কেননা, খোদার কালাম 'কালামে লফ্‌যী' হইলেও আমাদের কালামে লফ্‌যীর ন্যায় নহে। আমাদের সহিত আমাদের কালামে লফযীর যদিও এক খাছ সম্পর্ক রহিয়াছে, তথাপি উচ্চারিত হওয়ার পরেই উহা আমাদের সত্তা হইতে বিছিন্ন হইয়া যায়। কেননা, জিহ্বার সহিত ইহার উৎপত্তিস্থলগুলির কোনই সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সহিত তাঁহার কালামে লফযীর সম্পর্ক এরূপ নহে। যদিও দার্শনিকগণ ইহাকে কালামে লফ্‌যী নাম দিয়াছেন, তথাপি আল্লাহ্‌র কালামে লফ্‌যীকে আমাদের কালামে লফ্‌যীর উপর অনুমান করা ভুল—যদিও আল্লাহ্‌র সত্তা বা গুণের কোন যথার্থ দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নহে। যেমন, আরেফ রূমী বলেনঃ

اے بروں از وہم قال وقیل من ـ خاك بر فرق من وتمثیل من

"আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ধারণাও করা যায় না, অনুমানও করা যায় না, শব্দ এবং ভাষা দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ, কোন দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহাকে খাপ খাওয়ান যায় না।" কিন্তু সহজবোধ্য করার জন্য আমি উভয় কালামে লফ্‌যীর পার্থক্যের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। কেননা, দৃষ্টান্ত ভিন্ন পার্থক্য পরিষ্কার বুঝা যাইবে না। যেমন, মওলানা বলিয়াছেনঃ

بندہ نشکیبد ز تصویر خوشت ـ ہر دمت گوید کہ جانم مفرست

অর্থাৎ, যদিও প্রদত্ত দৃষ্টান্তের আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কোনই সামঞ্জস্য হইতে পারে না; বরং দুনিয়াতে এমন কোন পদার্থই নাই খোদা তা'আলার সহিত যাহার পূর্ণ অথবা কোনরূপ বাস্তব সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতীত তৃপ্তি হয় না। সুতরাং সর্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং মনের সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত উক্ত পার্থক্যের এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

মনে করুন, এক হইল সূর্য আর এক হইল উহার কিরণ—যাহা সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর উহার দীর্ঘাকৃতি কিরণশিখা, যাহা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অপর দিকে একখানি আয়না। প্রথমত উহার উপর সূর্যের কিরণশিখা পতিত হয়। অপর দিকে যমীন—যাহার উপর আয়নায় প্রতিফলিত দীর্ঘাকৃতি কিরণ-শিখা আয়না হইতে আসিয়া যমীনের উপর পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা যেন সূর্য এবং তাঁহার কালামে নফ্‌সী অর্থাৎ, তাঁহার কথা তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন গুণাবলীর অন্যতম—যাহা তাঁহার অবিকল সত্তাও নহে, তাঁহার সত্তার বিপরীত অন্য কিছুও নহে। এই কালামে নফ্‌সী সূর্যের আলোর ন্যায়, আর কালামে লফযী (স্বর ও শব্দ সমন্বয়ে গঠিত কালাম) সূর্যের সেই কিরণ-শিখার ন্যায়, যাহা সূর্যের গোলক হইতে নির্গত হইয়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হৃদয় আয়না সমতুল্য; আর আমরা যমীনের ন্যায়।

এই দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সন্দেহ দূর করা এবং আমাদের 'কালামে লফযী' বলিলে সাধারণত যাহা বুঝি, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে লফযীকেও সামঞ্জস্য ব্যতীত যেন তেমনই মনে করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে উভয় কালামে লফযীর পার্থক্যও পরিষ্কার হইয়া যায়। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, দার্শনিকরা তো আল্লাহ্‌র কালামে লফযীকে সৃষ্ট ও অস্থায়ী পদার্থ বলিয়াছে। অতএব, আল্লাহ্‌র কালামে লফযী ও আমাদের কালামে লফযীতে পার্থক্য যথাযথভাবে জানার উপায় নাই। তবে পার্থক্যের লক্ষণ এই যে, আমাদের কালামে লফযীকে আল্লাহ্‌র কালাম বলা জায়েয নহে।

আর কোরআনের পর্যায়ভুক্ত কালামে লফযীকে আল্লাহ্‌র বাণী বলা জায়েয। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহাও জানা যাইবে যে, সর্বসাধারণের দৃষ্টিপথে বিস্তৃত সূর্য-কিরণ অধিক তীব্র। সূর্যের খাছ কিরণ যেমন আমরা বর্‌দাশত করিতে পারি না, তদ্রূপ আল্লাহ্‌র কালামের জ্যোতি বিকিরণেও কালামে লফযীর তাজাল্লী আমরা বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের সামর্থ্যের দুর্বলতা।

এই কারণেই মূসা (আঃ)-এর প্রতি কালামে লফযীর তাজাল্লী হওয়ার পরেও যখন তিনি আরও অধিক তাজাল্লীর দরখাস্ত করিলেন, তখন জবাব আসিলঃ لَنْ تَرَانِىْ অর্থাৎ, তুমি আমাকে কখনও দেখিতে পারিবে না। অর্থাৎ, দর্শনীয় হওয়ার যোগ্যতা আমার মধ্যে পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। কোন বস্তুই আমাকে দেখার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কিন্তু তোমার মধ্যে আমাকে দেখার যোগ্যতা নাই। কেননা, আমি খালেছ নূর। আর তোমার দেহ মলিন পদার্থের সহিত মিশ্রিত। উহা আমার নূর বরদাশ্‌ত করিতে অক্ষম। তিনি যেন ইহাই বলিয়া দিলেন যে, তোমার মধ্যে এমন যোগ্যতাই নাই যে, আমাকে দেখার পর সুস্থ ও নিরাপদ থাকিতে পার। যদ্যপি ইহজগতে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখার যোগ্যতা না থাকার কথা সকলকেই পরিষ্কারভাবে বলিতেছিলেন এবং উহা শ্রবণের পর প্রত্যেক মু'মেনের মনে নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া অনিবার্য। হযরত মূসা (আঃ)-এর মনে নিজের যোগ্যতার বিশ্বাস হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু মূসা আলাইহিস্‌ সালাম 'আশেক' ছিলেন। সুতরাং আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে যদিও তিনি নিজের অযোগ্যতায় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু দর্শনলাভের আগ্রহ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, ইহার তীব্রতা তখনও হ্রাস পাইয়াছিল না। কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই মূসা (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেনঃ যদি এখনও তোমার মনে আমাকে দেখার আগ্রহ থাকে, তবে اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ الاية "তুমি এই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।" যদি পাহাড় স্থির থাকিতে পারে এবং আমার তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারে, তবে তোমাকেও বঞ্চিত করা হইবে না। ফলত فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ الاية যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা পাহাড়ের উপর নিজের নূর প্রকাশ করিলেন, পাহাড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন এবং নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। নিজের অযোগ্যতা নিজ চক্ষেই দেখিতে পাইলেন, পাহাড় এত দৃঢ় এবং বিরাট পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও যখন তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারিল না, তখন আমি কি বরদাশ্‌ত করিব?

যদি প্রশ্ন করা হয়, মূসা (আঃ)-এর সহিত পাহাড়ের কি সম্পর্ক? মূসা (আঃ) পূর্ণাঙ্গ (কামেল) মানুষ, নবী এবং কালীমুল্লাহ্‌! আর পাহাড় নির্জীব পদার্থ। সুতরাং فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ "পাহাড় যদি নিজের স্থানে নিরাপদে বহাল থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখিতে পাইবে"— এই বাক্যে পাহাড়ের স্থির থাকার উপর মূসা (আঃ)-এর দেখাকে অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমানের তাৎপর্য বোধগম্য হইতেছে না। হয়তো মূসা (আঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন। তবে উত্তর এই হইবে যে, মূসা (আঃ) স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে যে তাজাল্লী পাহাড়ের চেয়ে অধিক বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেন, তাহা তো তাঁহাকে পূর্বেও দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ, অন্তরের কিংবা রূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী তো তিনি পূর্বেও দেখিতে পাইতেন। কিন্তু এখন তিনি স্বচক্ষে দেখিবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শকদের দর্শন করা আর রূহের মধ্যে তাজাল্লী অনুভব করা এক নহে। চক্ষে দেখার জন্য চক্ষুর উপরই আল্লাহ্‌র তাজাল্লী প্রতিভাত হইতে হইবে। কিন্তু চক্ষু দেহের একটি ক্ষুদ্র, দুর্বল ও কোমল

অংশবিশেষ। পক্ষান্তরে নির্জীব হইলেও পাহাড়ও একটি দেহ, কিন্তু খুব দৃঢ় ও শক্তিশালী। ভারী হইতে ভারী বোঝা বহন করিতে সক্ষম। এই গুণে পাহাড় মানব দেহের যাবতীয় অংশ হইতে অধিক শক্তিশালী। যেমন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا الاية। "তোমাদের গঠনই অধিক দৃঢ়, না আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আসমানের?" আরও বলিয়াছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"অবশ্যই আসমান এবং যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ।" এতদুভয় আয়াত হইতেই আসমান-যমীনের গঠন মানুষের গঠন অপেক্ষা অধিক মজবুত ও দৃঢ় বলিয়া বুঝা যাইতেছে। সুতরাং পাহাড়ের ন্যায় এমন কঠিন ও সুদৃঢ় দেহ যখন আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রতাপের জ্যোতি বরদাশ্‌ত করিতে পারে নাই, তখন মূসা (আঃ)-এর চক্ষু আল্লাহ্ তা'আলার জগৎ উদ্ভাসী জ্যোতি দর্শনে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? সুতরাং দুর্বলতা এবং পাহাড়ের দৃঢ়তা সম্মুখে রাখিয়া যখন তিনি পাহাড়ের এরূপ অবস্থা দেখিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাস হইয়া গেল যে, তিনি বরদাশ্‌ত করিতে অক্ষম। এখানে বাহ্যদৃষ্টিতে আর একটি প্রশ্ন উঠে যে, ইহাতে তো মনে হয়, তখন তাঁহার উপর তাজাল্লী প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, তাঁহার উপরও তাজাল্লী প্রতিভাত হইয়াছিল। কেননা, মূসা (আঃ) তাজাল্লীর পরেই বেহুঁশ হইয়াছিলেন। যেমন, فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا الاية। আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রথমে তাজাল্লী হইয়া পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল এবং মূসা (আঃ)-ও বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব, মূসা (আঃ)-এর উপরও তাজাল্লী হইয়াছিল, এই আয়াতে পরিষ্কার তাহা বুঝা যায়।

ইহার উত্তর এই যে, ইহা তো স্বীকার্য কথা যে, তাজাল্লীর পরেই মূসা (আঃ) বেহুঁশ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতা দুই প্রকার, (১) সত্তা হিসাবে এবং (২) কালের হিসাবে। সত্তার হিসাবে মূসার বেহুঁশ হওয়া অবশ্যই তাজাল্লীর পরে হইয়াছিল। কালের হিসাবে নহে। কালের হিসাবে বরং তাজাল্লী এবং মূসার বেহুঁশ হওয়া একই সঙ্গে হইয়াছিল। যদি কালের হিসাবে তাজাল্লীর পর মূসা (আঃ) বেহুঁশ হইতেন, তবে অবশ্যই মূসা (আঃ)-এর উপরও তাজাল্লী হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত। কিন্তু শুধু সত্তা হিসাবে পরে হওয়াতে তাজাল্লী মূসা (আঃ)-এর উপর হইয়াছিল প্রমাণ করা কঠিন। কেননা, কাল হিসাবে উভয়টি একত্রেই হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাজাল্লী শব্দের অর্থ প্রকাশিত হওয়া। প্রকাশিত হইলেই উহাকে উপলব্ধি করা এবং দেখা অবধারিত নহে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা অবশ্যই প্রকাশ পাইয়াছিল। উহারই ফলে পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু মূসা (আঃ) তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার নূর প্রতিভাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু উহা বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা আমাদের নাই; বরং আল্লাহ্‌র নূর সর্বদা প্রকাশিত হইতেই চায়। যেমন, আরেফ জামী বলেন ঃ

نکور و تاب مستور ندارد - چو در بندی سر از روزن بر آمد

"আল্লাহ্ তা'আলার 'জামাল' আপাদমস্তক প্রকাশ্য, আবৃত থাকা পছন্দ করে না। যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার জ্যোতি দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়।" এই

কবিতার শব্দগুলির শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নহে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আত্মপ্রকাশ ইচ্ছাধীন। কেননা, তিনি দয়ালু এবং মেহেরবান, কাজেই বান্দাকে ডাকেন, আস ঃ "আমার তাজাল্লী হইতে ফয়েয হাসিল কর।" কিন্তু কি করি, আমাদের সে যোগ্যতা নাই যে, আমরা সেই ফয়েয লাভ করিতাম। তাঁহার কালামে লফ্‌যীর তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে ছিল, কাজেই উহার ফয়েয আমাদিগকে দান করা হইয়াছে। কিন্তু কখনও মনে করিবেন না যে, আমাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণ হইলেও ব্যক্তিগত যোগ্যতা কিছু ছিল বলিয়াই আমরা কালামে লফ্‌যীর তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করিতে সক্ষম হইয়াছি; বরং মনে করিতে হইবে, এই শক্তিও আমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলারই দান। সেই দানের ফলেই আজ উক্ত কালামে লফযীর নূরে আমাদের অন্তর আলোকিত।

তাজাল্লীর লক্ষণ বা ফল ঃ এই বরদাশ্‌ত শক্তির কারণে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, হয়তো কালামে লফ্‌যী স্বীয় মহিমা খর্ব করিয়া অপূর্ণতা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই আমরা বরদাশ্‌ত করিতে পারিয়াছি; বরং উহা স্বীয় মৌলিক কঠোরতা এবং প্রতাপের উপরই রহিয়াছে। উহার লক্ষণ এই যে, একদিন হুযূর (দঃ) যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রাঃ)-এর হাঁটুর উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এমন সময়ে ওহী নাযিল হইতে লাগিল। উক্ত ছাহাবী বলেন ঃ "তখন ওহীর ভারে আমার হাঁটু ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। আর একবার তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিলে ওহীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া উট বসিয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায়, হুযূর (দঃ)-কে সর্বোচ্চ বরদাশত শক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও ওহী নাযিল হওয়ার প্রতিক্রিয়া তিনি এত অধিক অনুভব করিতেন। অথচ আমরা আজকাল কালামে মজীদ তেলাওয়াত করি এবং উহা হইতে উপকার লাভ করি; কিন্তু সেই কঠিন প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয় না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কালামে পাক প্রথমত জিব্‌রাঈল (আঃ) -এর মাধ্যমে নাযিল হওয়ায় কিছুটা হালকা হইয়াছে। অতঃপর হুযূর (দঃ)-এর উপর নাযিল হইয়া আরও হালকা হইয়াছে। এই সকল মাধ্যমের পর এখন আমাদের বরদাশ্‌তের উপযোগী পরিমাণ হাল্‌কা হইয়াছে। যাহার ফলে আমরা উহা পড়িতে পারি, স্মরণ রাখিতে পারি। কিন্তু উহার মৌলিক মহত্ত্ব কোথাও যায় নাই। উহার প্রকৃত মহিমা ও প্রতাপ সেই দুই মহান ব্যক্তি বহন করিয়া নিয়াছেন। এখন উহা হাল্‌কা হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। যেমন, শিশুর দ্বারা কোন বোঝা উঠাইতে হইলে মাতা-পিতা তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তখন শিশুর জন্য উহা উঠাইয়া লওয়া সহজ হয়। কিন্তু এখনও যদি তাজাল্লীর ফল প্রকাশের পথ হইতে বাধা অপসারিত করা হয়, তবে উহার এত বড় ক্রিয়া অবশিষ্ট আছে যে, কোন কোন সময় অতিশয় ভয় ও বিনয়ের সহিত তেলাওয়াত করিতে থাকিলে অভিনব অবস্থার উৎপত্তি হয়। এমন কি কালামে মজীদ শ্রবণ করিয়া কোন কোন ওলীআল্লাহ্ এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের অন্তর খোদার নূরে আলোকিত ছিল বলিয়াই এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের অন্ধকার হৃদয়েও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই হয় যে, অনেক সময় কোরআন মজীদকে কোরআনের মত পাঠ করিলে এক বিচিত্র কোমলতা ও ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমরা কোরআন শরীফ পড়িতেই জানি না। যদি তেলাওয়াতের হক আদায় করিয়া ভয় ও নম্রতা মনে আনা হয়, তবে স্বাদ না লাগিয়াই পারে না। আরবে একজন

অতি নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র কিংবা সাধারণ লোকও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে তেলাওয়াতের হক তাহারাই আদায় করিয়া থাকে। বিবি ফাতেমা নাম্নী এক অন্ধ ও বৃদ্ধা রমণী মক্কা শরীফের বাবে ওমরায় বসিয়া সর্বদা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার তেলাওয়াতে এক আশ্চর্য মজা পাওয়া যাইত। সকল সময়ে তথায় শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। বন্ধুগণ! মজা শুধু আরববাসীর পড়াতেই সীমাবদ্ধ নহে। আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক যেখানেরই হউক না কেন, তাঁহার তেলাওয়াতে অবশ্যই এক বিচিত্র স্বাদ পাওয়া যায়।

মীরাঠের সড়ক পার্শ্বে এক মসজিদে জনৈক হাফেয ছাহেব তারাবীহ্‌র নামায পড়াইতেন। সড়কের সমস্ত যাতায়াতকারী, এমন কি ইংরেজরাও দাঁড়াইয়া তাঁহার কোরআন শরীফ শুনিত। তাজাল্লীর প্রভাব ইহার চেয়ে অধিক আর কি হইবে? বিশ্বাসী না হইয়া নির্বিকার চিত্ত হইলেও মনকে মহাশক্তির সহিত নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। সে মু'মেনই হউক বা কাফেরই হউক, উহার আকর্ষণশক্তি সকলের উপরই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কায় অবস্থানের জন্য কাফেরেরা এই শর্তারোপ করিয়াছিল যে, তিনি কালামে মজীদ শব্দ করিয়া পড়িতে পারিবেন না। কাফেরদের নারীদের উপর ইহার খুব প্রভাব পড়িয়া থাকে। খোদার মহিমা, মূর্খ এবং হীন প্রকৃতির কাফের নারীর উপরও কালামে মজীদ নিজের প্রভাব বিস্তার করিত। অনেক মানুষ শুধু কোরআন শুনিয়াই ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। ফলকথা, কোরআন আল্লাহ্‌র তাজাল্লী। তৎকালে আমরা তদুপযোগী ছিলাম বলিয়া তিনি কালামের মাধ্যমে আমাদিগকে নিজের জ্যোতি দেখাইয়াছিলেন। এখন হয়তো তিনি বলিতেছেন ঃ

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ۔ ہرکہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

"ফুলের পাতায় সুগন্ধ লুক্কায়িত থাকার ন্যায় আমি কালামের আবরণে লুক্কায়িত রহিয়াছি; আমার দর্শনকারী আমাকে কালামের দর্পণে দর্শন করিতে পারে।" এই কবিতাটি শাহ্‌যাদী যেবুন্নেসার। এই কবিতাটি সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। ইরানের বাদশাহ্ কবি না হইলেও হঠাৎ অনিচ্ছাক্রমে در ابلق کسے کم دیدہ موجود এই পদটি তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। বাদশাহ্ ইরানের কবিদিগকে ইহার দ্বিতীয় পদ যোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কেহই তাহা পারিল না। তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌র নিকট লিখিলেন যে, তথাকার কবিদের ইহার দ্বিতীয় পদ সংযোগের অনুরোধ করা হউক। শাহ্‌যাদী যেবুন্নেসা বড় কবি ছিলেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে প্রাতঃকালে তিনি চোখে সুরমা লাগাইতেছিলেন। কিছু সুরমা চোখের ভিতর প্রবেশ করিতেই সুরমামিশ্রিত এক বিন্দু চোখের পানি টপ্‌কাইয়া আয়নার উপর পড়িল। তৎক্ষণাৎ উক্ত কবিতার পদের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল এবং তিনি উহার দ্বিতীয় পদ রচনা করিয়া ফেলিলেন ঃ

در ابلق کسے کم دیدہ موجود ۔ مگر اشك بتان سرمه الود

"রূপসী রমণীর সুরমাময় চক্ষু হইতে নির্ঝরিত সুরমামিশ্রিত অশ্রুবিন্দু ব্যতীত সাদা-কাল মিশ্রিত রং-এর মোতি কে দেখিয়াছে?" তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ্‌কে খবর দিলেন; "শাহে ইরানকে লিখিয়া দিন—তাঁহার কবিতার দ্বিতীয় পদ পাওয়া গিয়াছে।" ইরানে ইহা পৌঁছিলে

তাঁহার বহু প্রশংসা করা হইয়াছিল। কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে, এই কবি একজন নারী। ইরানের বাদশাহ্ তথা হইতে কবির জন্য নানাবিধ পুরস্কার ও পোশাক হাদিয়া পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিলেন যে, কবিকে আমার দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ যেবুন্নেসাকে বলিলেন, ইরানের বাদশাহ্ তোমাকে দাওয়াত জানাইয়াছেন। বল, আমি তাঁহাকে কি লিখিব। যেবুন্নেসা বলিলেনঃ "আপনি উত্তরে আমার পক্ষ হইতে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়া দিন যে, কবি এই জবাব দিয়াছেনঃ

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل ـ هرکه دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

"আমি কথার পর্দায় এমনিভাবে আবৃত আছি যেমন ফুলের পাতার মধ্যে সুগন্ধ। আমার দর্শনকামী আমাকে কথার দর্পণে দর্শন করিতে পারে।"

ফলত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং ইরানের শাহ্ বুঝিলেন, কবি একজন নারী। যাহাহউক, যেবুন্নেসা এই কবিতায় বলিয়াছেন, আমার দর্শনাভিলাষী আমাকে আমার বাক্যের মধ্যে দেখিতে পারে। তবে কি ইহা কখনও হইতে পারে যে, যেবুন্নেসার কালাম তাহার পরিচয় দিবে, আর আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যাইবে না ? ইহা কখনও হইতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা যেন এখন বলিতেছেন যে, কেহ আমাকে দেখিতে চাহিলে আমার কালামের মধ্যে আমাকে দেখিতে পারে। এই মর্মেই কবি বলিয়াছেনঃ

چیست قرآں اے کلام حق شناس ـ رو نمائے رب ناس آمد بناس

"কোরআন শরীফ কি ? ইহা একটি দর্পণ, যাহাতে বান্দাগণ খোদার চেহারা দেখিতে পারে।"

বাস্তবিকই কোরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'আলাকে দর্শনের আয়না। আমার এই পূর্ণ বর্ণনার সার এই যে, কোরআন এক বিচিত্র বস্তু। আল্লাহ্ তা'আলার বিচিত্র, অভিনব, সুস্বাদু এবং রহস্যময় কালাম। ইহার গভীর তলদেশে পৌঁছা এবং ইহার সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করা মানব শক্তির বাহিরে। আপনাদের উচিত আল্লাহ্‌র এই সুমহান নেয়ামতের মর্যাদা দান করা। ইহা খুব মনোযোগের সহিত তেলাওয়াত করা, ইহার সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ হইতে ফায়দা হাসিল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। মর্মার্থ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করা এবং ইহার হেদায়ত অনুযায়ী আমল করা।

নশ্বরতা এবং অবিনশ্বরতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যকঃ এই একটি আয়াতই আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়া ইহার মতলব এবং ভাবার্থ বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম। ইহা হইতে উপকার লাভ করা আপনাদের কর্তব্য। অর্থাৎ, আখেরাতের স্থায়িত্বে এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখেরাতের প্রতি মহব্বত পয়দা করা উচিত। ইহলোকের যে সমস্ত বস্তু আখেরাত হইতে গাফেল করিয়া দেয়, উহাকে মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করা এবং দুনিয়ার এই তুচ্ছ ফায়দা ও সামান্য আরামকে লক্ষ্যস্থল করিয়া লওয়া উচিত নহে।

মোটকথা, আখেরাতের স্থায়িত্বের ও দুনিয়ার অস্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অনিবার্য পরিণতি দুনিয়ার প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হওয়া। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে দুনিয়াকে খেলাধুলা বলা হইয়াছেঃ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ দুনিয়ার স্বরূপকে যেন মাত্র দুইটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি لَهْوٌ (তামাশা) অপরটি لَعِبٌ (খেলা), এই দুইটি শব্দ বাহ্যদৃষ্টিতে সমার্থবোধক বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে কিছু ব্যবধান আছে। لعب، বলা হয়—অনর্থক কার্যকে, আর لهو বলে, আল্লাহ্ হইতে অমনোযোগীকারী কার্যকে। সারকথা এই

যে, দুনিয়ার মধ্যে দুই প্রকারের গুণ আছে। (১) অনর্থকতা। (২) এবং অমনোযোগী করা। প্রথমটিকে لعب এবং দ্বিতীয়টিকে لهو বলা হইয়াছে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত অংশই যদি অনর্থক হয়, তবে খোদার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই নিছক অনর্থক হইয়া পড়ে। অথচ খোদা তা'আলা নিছক অনর্থক এবং ফায়দাবিহীন এক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন মনে করা শুধু ধৃষ্টতাই নহে; বরং এক প্রকারের পাপও বটে। এতদ্ভিন্ন তিনি অন্য এক স্থানে বলিয়াছেনঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ ○

"তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি? এবং তোমরা আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে না?" এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল। অন্য এক আয়াতেও তিনি বলিয়াছেনঃ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا "হে আমাদের প্রভু! আপনি এই সমস্ত বস্তু অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।"

ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন পদার্থই নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যবিহীন নহে। অবশ্য কোন্ বস্তুর কি ফায়দা তাহা নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইহাতে ভুল হইতে পারে। প্রকাশ্যে আমরা দেখিতে পাই—দুনিয়া হইতে আমরা মূল্যবান ফায়দাও লাভ করিয়া থাকি। মানুষ সে সবের সাহায্যে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। অবশ্য এসমস্ত দুনিয়ার ফায়দা। দুনিয়ার যাবতীয় ফায়দার মধ্যে কতক ফায়দা প্রকৃতই হিতকর ছিল। আমরা সেসবের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করি নাই এবং কেবল নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকারী বিষয়গুলির মধ্যেই দুনিয়ার ফায়দাকে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। যদিও এসমস্ত ফায়দাকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ ইহাতে শান্তি পায়, উপকারও লাভ করে। কিন্তু ইহাতে সে যে পরলোকের বিরাট প্রাপ্য, অতি গুরুত্বপূর্ণ লাভ এবং মূল্যবান ফায়দা হইতে বঞ্চিত হইতেছে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি এবং এই ভুলের কারণেই আমরা কেবল এমন স্বার্থই উপভোগ করিয়া থাকি, যাহা মাত্র কয়েক দিনের জন্য নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকে, সত্যিকারের মক্‌সূদ এবং উহার সর্বাধিক উপকারিতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখে।

এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহকেই ফায়দা ও লাভ সাব্যস্ত করা এবং উহাতেই তৃপ্ত থাকার দৃষ্টান্ত অবিকল ঐ ব্যক্তিরই ন্যায়, যে ব্যক্তি রেলগাড়ীতে কোন দূর-দূরান্তের পথ সফর করিতেছে। পথে কোন স্থানে টেলিফোনের রিং শুনিয়া তথায় যাইয়া দাঁড়াইল এবং খুব মজার সহিত উক্ত রিং-এর আওয়ায শুনিতে ও বাজাইতে লাগিল। এদিকে গাড়ী ছাড়ার পথে। ইঞ্জিন হুইসেল বাজাইতেছে। এমন সময়ে যদি তাহাকে বলা হয়, ওহে পথিক—গাড়ী ছাড়িতেছে, হুইসেল বাজিতেছে। তখন সে বলে—বন্ধু, ইহার টন্ টন্ আওয়ায আমার নিকট খুব ভাল লাগিতেছে। আমি তো ইহা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। গাড়ী ছাড়িয়া যাউক বা থাকুক, তাতে কোন পরোয়া নাই।

অতএব, এই পথিককে উক্ত রিং-এর আওয়ায ও উহার স্বাদ যেমন মোহিত করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার সফব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ আপনারাও যদি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এবং চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহে মজিয়া থাকেন, তবে আপনাদের পরিণামও তাহাই হইবে। আসল উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন বড় প্রাপ্য লাভ করিতে পারিবেন না।

অতএব, দেখুন, যদিও দুনিয়াতে শান্তি লাভ করা এবং মন সন্তুষ্ট হওয়া লাভের তালিকাভুক্ত। কিন্তু তথাপি তাহা কত বড় ক্ষতিকর প্রমাণিত হইল। কেননা, ইহা এক অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান লাভ হইতে গাফেল করিয়া দিল।

দুনিয়ার কোন পদার্থই অনর্থক নহেঃ এইরূপে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুই মূলত সুবিধা এবং লাভে পরিপূর্ণ। কোন বস্তুই নিরর্থক এবং অকারণ নহে। কিন্তু যখন উহা প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া যায়, তখন এই লাভও—যাহাকে আমরা দুনিয়ার যাবতীয় ফায়দার মূলাধার মনে করিয়া রাখিয়াছি এবং খুব সম্মানের চক্ষে দেখিতেছি, ঐ সমুদয়কেই খেল-তামাশা বলা হইবে। অর্থাৎ, যেই আকারে আপনারা লাভ ও স্বার্থের পাছে দুনিয়া লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন. এমতাবস্থায় দুনিয়া আপনাদের জন্য খেল-তামাশার অধিক কিছুই নহে। যদিচ মূলত উহাতে বহু সুবিধা এবং লাভও রহিয়াছে; কিন্তু সেই লাভ এমন বিশেষ কিছু নহে, যাহাতে মগ্ন হইয়া আখেরাতের লাভ এবং স্বার্থ ভুলিয়া থাকিতে পারেন।

সারকথা এই যে, প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এবং লাভের জন্য দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, ঐ সমুদয় লাভ-স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে, দুনিয়ার কোন বস্তুই নিরর্থক এবং উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত লোকেরা যে সমস্ত মনগড়া লাভ-স্বার্থ ও উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়াছে, অথচ তাহা বাস্তবিকপক্ষে ক্ষতিকর, তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু খেল-তামাশা। যাহাহউক, দুনিয়া যদি আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতা ও বিরাগের কারণ হয়, তবে দুনিয়া খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন, ইহার বিপরীতপক্ষে বলা হইয়াছে— وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ অর্থাৎ, একদিকে দুনিয়াকে বলিয়াছেন খেল-তামাশা, অপর দিকে আখেরাতকে বলিয়াছেন জীবন। কেননা, পরিণাম ফলের বিবেচনায় খেল-তামাশা মৃত্যুর সমতুল্য। বস্তুত ফলের মৃত্যু মূলের মৃত্যুর পরিচায়ক। পক্ষান্তরে আখেরাতকে জীবিত বলা হইয়াছে, উহার ফল চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। আর ফলের জীবন মূলের জীবনের পরিচায়ক। সুতরাং আখেরাত নিজেও জীবিত। বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার লাভ-স্বার্থসমূহ অস্থায়ী এবং মৃতই বটে। অতএব, আমরা জীবিত লাভ-স্বার্থ ছাড়িয়া মৃত ফায়দা নিয়া কি করিব? উপকারী বস্তুকে ছাড়িয়া নিরর্থক বস্তুর পাছে লাগা বোকামি বই আর কি? এই জন্যই সম্মুখের দিকে বলিতেছেন, لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ "আহা! ইহারা যদি নিজেদের ধর্মীয় লাভ-স্বার্থ অনুভব করিতে পারিত, দুনিয়াবী ক্ষতি জানিতে পারিত এবং দুনিয়া ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুকে ক্ষতিকর এবং আখেরাত ও তৎসম্পর্কিত সবকিছুকে হিতকর ও শান্তিদায়ক মনে করিত!"

এখানে لو, অব্যয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা কখনও কখনও আকাঙ্ক্ষার অর্থেও আসে। এস্থলে আকাঙ্ক্ষার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে চরম পর্যায়ের দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। যেমন, কোন স্নেহময় পিতা নিজ পুত্রের সহিত স্নেহসূচক কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। স্নেহপরবশ হইয়া পুত্রের সহিত নিজেও তোত্‌লা সাজেন। উপমা নহে, এইরূপে খোদা তা'আলার সত্তার পক্ষে কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হওয়া অসম্ভব এবং তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও অপার মহিমার বিপরীত। কেননা, আকাঙ্ক্ষা এমন বস্তুরই করা হয়, যাহা সাধারণত লাভ করা যায় না এবং উহার প্রয়োজনও আছে। অথচ খোদা তা'আলা মহাশক্তিমান ও চিরস্থায়ী, যাবতীয় বস্তুর মালিক। তাঁহার জন্য দুর্লভ কিছুই নহে। দ্বিতীয়ত, তিনি কোনকিছু লাভ করার মুখাপেক্ষীও নহেন। তবে তিনি আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বীয় বান্দাগণের মনসন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাদের রুচি

অনুযায়ী তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য শুধু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া। বুঝাইয়া দেওয়ার দুইটি উপায় ছিল। (১) বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ হওয়া। (২) বান্দা যেহেতু যোগ্যতার অভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুরূপ হইতে পারে না, কাজেই বান্দার খাতিরে আল্লাহ্ বান্দার অনুরূপ হওয়া। এই কারণেই কোরআনের যে সমস্ত স্থানে আশা-আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক শব্দ আসিয়াছে, তথায় প্রকৃতই আল্লাহ্‌র আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্য নহে। এইরূপে যে সমস্ত জায়গায় বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দ আসিয়াছে, সেখানেও প্রকৃত বিস্ময় উদ্দেশ্য নহে। অর্থাৎ, খোদা তা'আলা কোন ব্যাপারে বিস্মিত হন না। কেননা, বিস্ময়জনক বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলেই জ্ঞানলাভের পর বিস্ময় আসে। যেমন, কোন ব্যক্তির জানা ছিল না যে, তাহার ভাই আসিবে। ঘটনাক্রমে কোন সংবাদ প্রদান ব্যতীত আসিয়া পড়িলে বিস্ময়বোধ করে। বলে, হাঁ! তুমি কেমন করিয়া আসিয়া গেলে! মোটকথা, বিস্ময়ের জন্য সর্বদা অজ্ঞ থাকা অনিবার্য। অথচ খোদা তা'আলা তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার জ্ঞান সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বিষয় এবং বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং কোন বিষয় কিংবা ঘটনা তাঁহার পক্ষে পেরেশানী কিংবা বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে না; বরং বিস্ময়বোধক শব্দে উদ্দেশ্য হয় বিস্মিত করা—বিস্মিত হওয়া নহে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন ঃ এই বিষয়টির জন্য তোমাদের বিস্মিত এবং পেরেশান হওয়া উচিত। আমি কি বিস্মিত হইব? আমার দৃষ্টিতে কোন বিষয়ই বিস্ময়কর নহে। এইরূপে আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারও। "আমার নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই, সমগ্র জগৎ আমার সৃষ্ট এবং অধীন। অতএব, আমি কি আকাঙ্ক্ষা করিব! তবে হাঁ, নিঃসন্দেহ, এই বিষয়টি তোমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য বটে।"

আল্লাহ্! আল্লাহ্!! আল্লাহ্‌র কি শান! কেমন তাঁহার দয়া! যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বান্দা এত অনুভূতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজেদের ক্ষতিকর এবং লাভজনক বস্তুরও আশা-আকাঙ্ক্ষা করে না। তখন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, নিজে আকাঙ্ক্ষী সাজিয়া সচেতন করিয়া দিলেন যে, এই বিষয়টি তোমাদের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী। যেমন, একজন স্নেহশীল পিতা বলেন ঃ "আহা! যদি আমার পুত্র পড়াশুনা করিত।" অথচ পুত্র পড়াশুনা করিলে পিতার কোন লাভ হইত না। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমার পুত্র বুঝুক যে, পড়াশুনাও আকাঙ্ক্ষা করার উপযোগী বস্তু বটে।

এইরূপে আমরা যদি আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান লাভ করি, তবে কি ধারণা করা যাইতে পারে যে, আমাদের এই জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কোনরূপ লাভবান হইবেন? (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলার কোন লাভ নাই। শুধু আমাদেরই লাভ।

আল্লাহ্ তা'আলার অভাবশূন্যতার স্বরূপ ঃ আমি যে আল্লাহ্ তা'আলাকে অভাবশূন্য বলিলাম, এই অভাবশূন্যতার অর্থ বেপরোয়াভাব নহে; যেমন, মূর্খেরা তাহা মনে করিয়া থাকে। কি নিকৃষ্ট অর্থ—কোন যুবক মানুষ দুই-চারিটি সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে যেখানেই দুই-চারি জন একত্রিত হয়, এইরূপে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করে। কেহ বলে, "আহা! কেমন যুবক অবস্থায় মরিল!" আর একজন বলে ঃ "হাঁ ভাই, কেমন ছোট ছোট সন্তানগুলি রাখিয়া মরিয়াছে। নিরীহ বেচারাগণ অভিভাবকশূন্যই রহিয়া গেল।" তৃতীয় জন বলে ঃ "হাঁ মিঞা! আল্লাহ্ পাক বড়ই বেপরোয়া। যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, সেখানে টুঁশব্দটি করিবার জো নাই।" খোদার গযব! এই ক্ষেত্রে বেপরোয়া শব্দের অর্থ ইহাছাড়া আর কি হইবে যে, লোকে মনে করে, (নাউযুবিল্লাহ্)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণের সুবিধা-সুযোগের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। বান্দার অবস্থার প্রতি তিনি একদম অমনোযোগী এবং বেপরোয়া। তাঁহার নিকট কোনই সু-বিধান নাই। দেখুন, ইহা কত বড় বেআদবী! আপনি আপনার গোলামকে জোলাব খাওয়াইয়া তাহার সুবিধার্থে গৃহবাসীদের হইতে পৃথক নির্জন স্থানে রাখিয়াছেন, যেন কোলাহল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্র মনে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অথচ ইহা দেখিয়া কোন সমালোচক যদি বলে, দেখ, কেমন বেপরোয়া লোক! নিরীহ গোলামটিকে ঘরের বাহিরে নির্জনে রাখিয়াছে, তাহার এরূপ মন্তব্যে কি আপনি বলিবেন না যে, মিঞা! আমি তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহাকে ঘরের বাহিরে পৃথক নির্জনে রাখিয়াছি? একটু পরেই আবার আমাদের সঙ্গে বাস করিবে।

অতএব, দেখুন, আপনিও আপনার ব্যবহার সম্বন্ধে এতটুকু মন্তব্যই নাপছন্দ করিলেন। যে খোদা সর্বদা নিজের বান্দাগণের অবাধ্যতা এবং নাফরমানী সত্ত্বেও তাহাদের মঙ্গল ও শান্তির ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাদের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের দয়া ও অনুগ্রহ করিতেছেন, তিনি কি বান্দার এরূপ কৃতঘ্নতা ও বাড়াবাড়ি নাপছন্দ করিবেন না? তুমি কি জান? যাহাকে তুমি অমনোযোগিতা ও বেপরোয়াভাব মনে করিতেছ, উহাই হয়তো তাহার প্রতি প্রত্যক্ষ মনোযোগ হইতে পারে। আল্লাহ্‌র হেকমত কেহ জানিতে পারে না।

মোটকথা, اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ লক্ষ্যহীনতা এবং বেপরোয়াভাব মনে করা মহাভুল। এই ভুলের মূল কারণ শুধু এই যে, اِسْتِغْنَاءٌ শব্দটি আরবী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ শুধু অমুখাপেক্ষী। এই অর্থে ইহা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর অন্যতম। আর উর্দু ভাষায় ইহার অর্থ বেপরোয়াভাব, অমনোযোগ ও লক্ষ্যহীনতা। আপনারা কোরআন শরীফে غَنِىٌّ এবং اِسْتَغْنَى اللهُ প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া উর্দু ভাষার প্রচলিত অর্থ অনুসারে ইহার অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন এবং লোকে اِسْتِغْنَاءٌ অর্থ বেপরোয়াভাব এবং লক্ষ্যহীনতা বুঝিয়া বসিয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে যেমন غَنِىٌّ حَمِيْدٌ বলিয়াছেন, তদ্রূপ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ও বলিয়াছেন। যদি غَنِىٌّ শব্দের অর্থ বেপরোয়া, লক্ষ্যহীন ও বিশৃঙ্খল বলা হয়, তবে رَءُوْفٌ -এর কি অর্থ হইবে? رافة এবং بے پروائی -এর মধ্যে তো বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, رافة শব্দের অর্থ চরম অনুগ্রহ এবং দয়া; আর بے پروائی এবং অমনোযোগিতা ও লক্ষ্যহীনতা নিষ্ঠুর এবং অবিচারক লোকের কাজ। সুতরাং বুঝা গেল, اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ বেপরোয়াভাব নহে; বরং খোদার اِسْتِغْنَاءٌ -এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ মানুষের কাজের মুখাপেক্ষী নহেন। সুতরাং তাহাদের কাজ তাঁহার কোন হিতও করিতে পারে না, অহিতও করিতে পারে না। তোমরাও আল্লাহ্‌র কোন উপকার বা অপকার করিতে পার না।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ اللهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ববাসী হইতে অভাবশূন্য" আয়াতের সঙ্গে বলিয়াছেন, مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ "যে কেহ পরিশ্রম সহকারে নেক আমল করে সে নিজের লাভের জন্যই করিয়া থাকে।" এইরূপে আরও বলিয়াছেনঃ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ "তোমরা যদি কুফরী কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন।" ইহাতে বলা যায়, যে ব্যক্তি 'শেরেকী' করে সে নিজেকেই ক্ষতি ও অপমানের গহ্বরে নিক্ষেপ করে এবং দোযখের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হইয়া যায়। তিনি যেমন মানুষের নেক আমলের মুখাপেক্ষী নহেন, তদ্রূপ তাহাদের কুফরী এবং শেরেকীও তাঁহার ক্ষতির কারণ নহে। ইহাই استغناء -এর অর্থ। আপনি যদি বলেন, মাতৃহারা ছোট ছোট শিশুর পিতারও

যখন রূহ্ কবয করিয়া লন, আমার বুঝে আসে না, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার চরম অনুগ্রহ কিরূপে হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অধিক বিশৃঙ্খলা এবং লক্ষ্যহীনতা, দয়াহীনতা কি হইতে পারে?

মিঞা, আপনার এমন বুদ্ধির প্রতি আফসোস! আপনি কি জানেন? প্রকৃতপক্ষে এই শিশুরাও তাঁহারই, তাহাদের পিতাও তাঁহারই। উভয়েই তাঁহারই স্বত্বাধীন। তাহাদের সুবিধার চিন্তা আপনি অধিক করিতে পারেন, না তিনি? তিনি তাহাদের পিতাকে যেমন লালন-পালন করিয়া এত বয়স্ক করিয়াছেন, শিশুদিগকেও প্রতিপালন করিয়া বড় করিতে পারিবেন। তুমি তাহাদের কে? মধ্যস্থলে আসিয়া হস্তক্ষেপ এবং মন্তব্য করিতেছ? কি সাংঘাতিক হঠকারিতা! মানুষ কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অমনোযোগিতা ও দয়াহীনতা প্রমাণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে? অথচ সেই দরবারের নিয়ম এই যে, তাঁহার জন্য পূর্ণতাসূচক কোন গুণ প্রমাণ করিতেও প্রয়োগবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। তাঁহার গুণ-গান এবং প্রশংসার ক্ষেত্রেও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য খুব কড়া নির্দেশ রহিয়াছে।

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছিলেনঃ বৃষ্টি হইতে লাগিল। তীব্র গরম পড়িতেছিল। মানুষ পানির জন্য ব্যাকুল ছিল। এমন সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, সোব্‌হানাল্লাহ্! আজ কেমন উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র দরবার হইতে ধমক আসিল, বেআদব? কোন্ দিন অনুপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি হইয়াছে যে, কেবল আজই তুমি উপযুক্ত সময় দেখিলে? মোটকথা, সেই দরবারে কোন পূর্ণতা গুণারোপেও প্রয়োগবিধির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সত্য কথা এই যে, আমরা তো কোন প্রকারেই তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না। ইহাও তাঁহার অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি প্রশংসার নিয়মও আমাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছেন। অন্যথায় আমাদের প্রশংসার স্বরূপ তো এইঃ

شاه را گوید کسے جولا یه نیست – این نه مدح ست او مگر آگاه نیست

"কেহ বাদশাহ্‌র উদ্দেশে বলে, ইনি জোলা নহেন। ইহা প্রশংসা হইল না। কিন্তু তাহার চৈতন্য নাই।"

বন্ধুগণ! উক্ত বুযুর্গ লোক প্রশংসাই করিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কার-বর্জিত বেমানান শব্দ প্রয়োগের দরুনই ধমক দেওয়া হইয়াছিল। সেই দরবারে খুব সাবধানতার সহিত পা রাখিতে হয়। বাস্তবিক, কতক শব্দ এমন আছে, যাহা প্রকাশ্যে তেমন কর্কশ মনে হয় না, কিন্তু কখনও স্থানোচিত না হওয়ার কারণে এবং কখনও সম্বোধিত জনের মর্যাদানুরূপ না হওয়ায় তাহা বেআদবী ও অশিষ্টাচারের মধ্যে গণ্য হয়। বস্তুত উক্ত বুযুর্গ লোককেও কেবল 'আজ' শব্দটির জন্য এমন কঠিন ধমক দেওয়া হইয়াছিল। অথচ আমাদের ধারণায় এই শব্দটির মধ্যে বেআদবীর কিছুই ছিল না।

অতএব, যখন একটুখানি নিয়ম পরিবর্তনে এবং শব্দ বেমানান হওয়ার কারণে এমন ধমক দেওয়া হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কোন দোষারোপের জন্য যতই ধমক দেওয়া হউক, তাহা খুবই কম হইবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার শানে ত্রুটি বাহির করা বড় অপরাধ এবং ভীষণ বেআদবী। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বলিয়া ফেলে, "নিন্, সামান্য একটি কথার উপর কেমন কঠিন ধমক দেওয়া হইল। এমন কি-ইবা জঘন্য কথা ছিল?" অথচ তাহারা চিন্তা করিয়া কাজ করে না। অন্যথায় তাহারা বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের এরূপ উক্তিও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা,

এসমস্ত উক্তি সামান্য নহে। ইহা সেই শ্রেণীর কথা—আমাদের কথাবার্তায়ও আমরা এই জাতীয় কথার প্রতিবাদ করিয়া থাকি।

মনে করুন, আপনি প্রত্যহ ঠিক সময়ে অফিসে যান। একদিন যদি আপনার অফিসার আপনাকে বলেনঃ "আজ তো আপনি খুব ঠিক সময়ে অফিসে আসিয়াছেন।" তবে আপনার নিকট কেমন খারাপ বোধ হইবে। আপনি মনে করিবেন, "আমি প্রত্যেক দিনই তো ঠিক সময়েই আসিয়া থাকি। তিনি বলিলেন যে, আমি আজ খুব ঠিক সময়ে আসিয়াছি। আমি যেন আর কোন দিন সময়মত আসিই নাই।"

এইরূপ কোন প্রভু যদি তাহার চাকরকে কোন কাজের জন্য পাঠান, সে কাজ করিয়া আসিলে যদি তিনি তাহাকে বলেনঃ "আজ তো খুব কাজ করিয়াছ।" আপনিই বুঝিতে পারেন, উক্ত চাকরের মনে কেমন কষ্ট হইবে।

অতএব, আমাদের যখন এই অবস্থা—এই শ্রেণীর কথায় মনে কষ্ট পাই, এই শ্রেণীর শব্দ এমন কষ্টদায়ক হয়, তবে এই জাতীয় শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কেন হইবে না? তাঁহার নিকট এরূপ কথা অপরাধ কেন হইবে না? যদিও আমরা জানি যে, 'আজ' শব্দটি এরূপ ক্ষেত্রে অনিচ্ছাক্রমে হঠাৎও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তথাপি যেহেতু শব্দটি অশোভনীয়, কাজেই এসমস্ত শব্দ মনে বিঁধে। সামান্য মানুষেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন আহ্কামুল হাকেমীনের দরবারের কি অবস্থা হইবে, সহজেই অনুমেয়।

لو، অব্যয়টি প্রসঙ্গে এত কথা বলিয়া ফেলিলাম। অর্থাৎ, এস্থলে আকাঙ্ক্ষাসূচক অব্যয় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এমন দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমাদের জ্ঞান লাভ করাতে তাঁহার কোন লাভ নাই। তথাপি আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক অব্যয়ের সহিত উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ বুঝাঃ এখন كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। কোরআন শরীফের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয়গুলি কেমন বিচিত্র। প্রত্যেকটি শব্দে এল্‌মের সমুদ্র। এই আয়াতে لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ বাক্যের দ্বারা একটি সূক্ষ্ম ও মনোরম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, দুনিয়ার লোক দুনিয়ার অন্বেষণে এত মশ্‌গুল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে তো অজ্ঞ আছেই, দুনিয়া সম্বন্ধেও অজ্ঞ। এই জন্য এক আয়াতে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার স্বরূপ চিনিয়া লওয়ার প্রতিও উৎসাহিত করা হইয়াছে।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতটিকে এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ সম্বন্ধে খুব গভীরভাবে চিন্তা কর।" ইহাতে বুঝা যায়, যে দুনিয়ার জন্য তোমরা প্রাণপাত করিতেছ, তাহা তামাশা মাত্র। তোমরা উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ। আস, উহার স্বরূপ আমার নিকট হইতে শুনিয়া লও, উহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং উহার সুন্দর ও প্রশংসনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা কর তৎসঙ্গে আখেরাতের তথ্যও অবগত হও, যাহার প্রতি তোমাদের আদৌ মনোযোগ নাই। অতঃপর দেখ, এখন পর্যন্ত তোমরা এমন উপকারী ও লাভজনক বস্তু হইতে অমনোযোগী ছিলে এবং এক অনর্থক ও বেদরকারী বস্তুর পশ্চাতে ঘুরিতেছিলে। অতএব, এখন দুনিয়ার মোহ ত্যাগ কর ও উহার চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহে পদাঘাত কর এবং চিরস্থায়ী বস্তু আখেরাতের প্রতি আগ্রহশীল হও। তথা পর্যন্ত পৌঁছিবার চেষ্টায় লাগিয়া যাও।

এই কারণে لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার স্বরূপ বলিয়া দেওয়ার মধ্যে এক উপকারিতা ইহাও আছে যে, প্রত্যেক বস্তুকে উহার বিপরীতের সাহায্যে উত্তমরূপে জানা যায়। অর্থাৎ, দুনিয়ার স্বরূপ ভালরূপে জানিতে পারিলেই তোমরা আখেরাতের স্বরূপ পূর্ণ ও বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে পারিবে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি বোরকা পরিহিতা একজন বিশ্রী রমণীকে দেখিল এবং তাহার বাহ্যিক সুডৌল গঠন ও চলার ভঙ্গি দেখিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। এখন তাহার আসক্তি নিবারণ করার এক কার্যকরী উপায় এই হইতে পারে যে, তাহাকে বিবাহ করাইয়া বোরকা পরিহিতা রমণী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক সুন্দরী নববিবাহিতা বধূর চেহারা দেখাইয়া দেওয়া হয়। তদ্রূপ উক্ত উপায়কে পরিপূর্ণ করার জন্য ইহাও উত্তম উপায় যে, বোরকা মুক্ত করিয়া সেই বিশ্রী রমণীর কদর্য চেহারাও তাহাকে দেখান হয়। তখন তাহার এই অনুভূতি জন্মিবে যে, ইহার তুলনায় আমার স্ত্রী বহুগুণে সুন্দরী ও সুশ্রী। অন্যথায় বিবাহের পরেও তাহার এই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে যে, না জানি সেই বোরকা পরিহিতার বিশ্বদাহী সৌন্দর্যের কি অবস্থা! মোটকথা, বোরকাবৃতা থাকা পর্যন্ত সেই রমণীর প্রতি তাহার আসক্তির মূল পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইবে না। অথচ বোরকা উঠাইতেই উক্ত রমণীর সৌন্দর্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর তাহার প্রতি আসক্তির পরিবর্তে ঘৃণা এবং মহব্বতের পরিবর্তে বিরক্তি আসিয়া পড়িবে। এইরূপে আখেরাতরূপী নববধূর মূল্য তখনই হইবে যখন এই ডাইনী দুনিয়ার ঘৃণিত আকৃতিও ভালরূপে দেখিতে পাইবে এবং ইহার কদর্যতা জানিতে পারিবে। যদি দুনিয়ার কৃত্রিম রূপ খুলিয়া দেখান না হইত এবং শুধু আখেরাতের সৌন্দর্যই বর্ণনা করা হইত, তবে আখেরাতের এত গুরুত্ব হইত না এবং দুনিয়ার খেয়াল অন্তর হইতে দূর হইত না। এই কারণেই মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও ইহার অনিষ্টকারিতার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন এবং আখেরাত ও উহার লাভ এবং উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার ফলে দুনিয়ার মহব্বত অন্তর হইতে পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহাতে আখেরাতের অনুরাগ জন্মে। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার খাছ অনুগ্রহ এবং রহমত। তিনি শুধু আমাদের হিতের জন্য এই ঘৃণিত দুনিয়ারও উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে অনুপম কালামের মধ্যে ঘৃণিত পদার্থের উল্লেখ থাকা জ্ঞানের বাহিরে এবং অযৌক্তিক।

এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী মনে পড়িয়াছে। একবার হযরত রাবেয়া বছরীর (রঃ) দরবারে কয়েকজন বুযুর্গ লোক দুনিয়ার নিন্দাবাদ এবং ইহার দোষ-ত্রুটির কথা বর্ণনা করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেনঃ قُوْمُوْا عَنِّىْ فَاِنَّكُمْ تُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا "তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও। তোমরা দুনিয়াকে ভালবাস।" তাঁহারা বলিলেনঃ "আমরা তো দুনিয়ার নিন্দাই করিতেছি।" তিনি বলিলেনঃ مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهٗ "দুনিয়ার আলোচনায় তোমাদের মশ্‌গুল হওয়া, যদিও নিন্দার আকারে হইয়া থাকে, ইহা অনুরাগেরই লক্ষণ।" কেহ কোন যালেম বাদশাহ্‌র সহিত কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকিলে তাহার আলোচনা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কোন চামারের সঙ্গে তাহা করিলে কখনও আলোচনা করে না। ইহার কারণ এই যে, বাদ্‌শাহ্‌কে প্রতাপশালী মনে করিয়া তাহার সহিত বীরোচিত কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বিষয় মনে করে। সুতরাং তাহা লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায়। পক্ষান্তরে চামারের বেলায় তাহা করে না। বুঝা গেল, নিন্দাবাদও মর্যাদাসম্পন্ন বস্তুরই করা হয়। এইরূপে দুনিয়ার নিন্দা করিয়া বেড়াইলে

প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ পায় যে, "আমরা দুনিয়ার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বস্তুর নিন্দাবাদ করিতেছি।" দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্বকে মনে স্থান দেওয়ার অর্থই হইতেছে দুনিয়াকে ভালবাসা।

দেখুন, ওলীআল্লাগণের দরবারেও এই ঘৃণিত দুনিয়ার আলোচনা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার কালামে ইহার আলোচনা তো আরও অসঙ্গত হওয়ার কথা। তথাপি আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলিয়া দেওয়া ব্যতীত আমরা ইহার স্বরূপ জানিতে পারি না। প্রতিমার দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্যে যেমন মাছি-মশার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর উল্লেখ কোরআন শরীফে করা হইয়াছে, তদ্রূপ নিন্দা ও ঘৃণা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঘৃণিত দুনিয়ারও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাচাই করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে বিপরীত পথে আখেরাত সম্বন্ধেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

এখানে কেহ যদি প্রশ্ন করে যে, খোদা তা'আলা দুনিয়ার উল্লেখ করার পশ্চাতে যেমন একটি যুক্তি দেখান হইল, তদ্রূপ রাবেয়া বছরী উক্ত বুযুর্গ লোকদের দুনিয়ার আলোচনাকে এই যুক্তি অনুসারে সঙ্গত মনে করিলেন না কেন? তবে উত্তর এই দেওয়া হইবে যে, কোরআনে দুনিয়ার উল্লেখের এই যুক্তি তো স্পষ্ট কথা। কেননা, আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বুযুর্গদের কথায় এই যুক্তি না থাকার কারণ এই যে, তাঁহাদের নিকট দুনিয়াদার কেহ ছিল না, যাহাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ উৎপাদন উদ্দেশ্য হইত। সুতরাং তাঁহাদের দুনিয়া সম্বন্ধে আলোচনার অর্থ হইবে তাঁহারা দুনিয়াকে বড় বস্তু মনে করিয়া উহা বর্জন করার জন্য গৌরব প্রকাশ করিতেছেন। যেমন, কোন দরবেশ দরবেশী প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দরবেশী কাজের বর্ণনা করিয়া থাকেন। যেমন বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে এত এত টাকা লইয়া আসিয়াছিল। আমি এক কর্পর্দকও গ্রহণ করি নাই, সমস্তই ফিরাইয়া দিয়াছি। ইহা বড় রকমের পদস্খলন। ইত্যাকার পদস্খলন অনুভবও করা যায় না।

এক বুযুর্গ লোক অপর এক বুযুর্গ লোকের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। গৃহস্বামী তাঁহার চাকরকে নির্দেশ দিলেন, আমি দ্বিতীয় হজ্জের সময় যেই সোরাহীটি মক্কা শরীফ হইতে আনিয়াছি, মেহ্‌মানকে উহাতে পানি দিও। মেহ্‌মান বলিলেনঃ "তুমি রিয়াজনক কথা দ্বারা তোমার উভয় হজ্জের সওয়াব নষ্ট করিয়া দিলে।"

পদস্খলন সকলেরই হইয়া থাকে। কেননা, ফেরেশ্‌তা ও নবী ছাড়া আর কেহই নিষ্পাপ নহে। কিন্তু পদস্খলন উপলব্ধি করিতে পারাও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মঞ্জিল। এমন অতি অল্প লোকই আছে যাহারা নিজের পদস্খলন সম্বন্ধে অবহিত হয়। সুতরাং রাবেয়া বছরী (রঃ)-এর দরবারস্থ উক্ত বুযুর্গ লোকগণ এই রোগেই হয়তো আক্রান্ত ছিলেন, তাহাতে বিচিত্র কি? এই কারণেই তাঁহাদের মুখ হইতে দুনিয়ার নিন্দা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ) তাঁহাদের রোগ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে ঘৃণিত বস্তুর আলোচনায় অন্তরে সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে আশঙ্কায় তিনি শয়তানের প্রতিও লা'নত করিতেন না। এতক্ষণ শয়তানের পাছে পড়িয়া কে সময় নষ্ট করিতে যাইবে? ততক্ষণ মাহ্‌বুবের যেকের কেন করি না এবং ইহাও ভাবিতেন যে, শয়তানকে লা'নত না করিলেও জবাবদিহি করিতে হইবে না। কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদও হইবে না, কিন্তু মাহ্‌বুবের যেকের না করিলে উহার হিসাব-নিকাশ হইবে। সারকথা এই যে, যতক্ষণ আমি শয়তানের উপর লা'নত করিব, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র যেকেরে সময় কাটানই উত্তম হইবে, তাহাতে খোদার দরবারে হিসাব-নিকাশ হইতে অব্যাহতি পাইব। ইহাও সম্ভব যে, এইরূপে তিনি উক্ত বুযুর্গ লোকদিগকে

দুনিয়ার আলোচনা করা হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে তত ফায়দা নাই, আল্লাহ্‌র যেকেরে যত ফায়দা আছে। কাজেই বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ?

অতএব, খোদার প্রিয় বান্দারা যখন দুনিয়াকে এত ঘৃণিত মনে করেন যে, নিজেদের মজলিসে ইহার আলোচনাও পছন্দ করেন না। নাম লওয়াও সময় নষ্ট হওয়ার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তখন ইহা আল্লাহ্‌র কালামে আলোচিত হওয়ার যোগ্য কেমন করিয়া হইবে? তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার আলোচনা করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চেতনা হয় এবং আমরা সতর্ক হই। ইহা তাঁহার পূর্ণ অনুগ্রহ যে, স্বীয় বান্দাগণের জন্য একটি ঘৃণিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মোটকথা, ছোট একটি আয়াত, অথচ তাহাতে কত রকমের দয়া এবং অনুগ্রহ রহিয়াছে। প্রত্যেকটি অংশ দ্বারাই আমাদিগকে সচেতন এবং সতর্ক করিয়াছেন।

নফ্‌সকে পবিত্র করিবার উপায়ঃ উপরোল্লিখিত পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, শুধু দুইটি বস্তুকে সর্বদা নিজের লক্ষ্যস্থল করিয়া রাখ। প্রথমত, দুনিয়ার অস্থায়িত্ব স্মরণে রাখিয়া উহার প্রতি মনের অসন্তোষ উৎপাদন। দ্বিতীয়ত, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া উহা লাভ করার উপায় অন্বেষণ। সাধারণভাবে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব স্মরণ রাখাও প্রতি মুহূর্তের ওযীফাবিশেষ। কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্যও প্রতিদিন অন্তত একবার অবশ্যই একটি সময় নির্ধারিত করিয়া লওয়া উচিত। তাহা এইরূপে করিবে—প্রত্যহ ঘুমাইবার উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় শয়ন করিবে, তখন নিজের সারাদিনের ভাল-মন্দ কার্যসমূহ, এবাদত এবং নাফরমানীকে সম্মুখে রাখিয়া তন্মধ্য হইতে মন্দ কার্য ও নাফরমানীমূলক কার্যগুলিকে পৃথক করিবে এবং ভাল কার্যগুলিকেও পৃথক করিবে। অতঃপর যে সমস্ত গুনাহের কাজ করা হইয়াছে উহাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ও আযাবের ধ্যান করিবে এবং মনে করিবে যে, আমি খোদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আমার হিসাব-কিতাব হইতেছে। আমার এই পরিমাণ গুনাহ্ আছে, তজ্জন্য আমার এই পরিমাণ শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাই দুনিয়া আখেরাতের বিশেষ রকমের স্মরণ।

এইরূপে স্মরণ করার পর আরও দুইটি কাজ করিবেঃ (১) খোদার সহিত ওয়াদা করিবে যে, ভবিষ্যতে পাপকার্য হইতে দূরে থাকিবে। (২) আর উক্ত তওবা ও ওয়াদার উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করিবে—"হে খোদা! আমাকে তওফীক দাও, যেন তওবা ও ওয়াদার উপর দৃঢ়পদ থাকিতে পারি।" এই তওবার প্রয়োজনীয়তা তো প্রকাশ্যেই বুঝা যায়। দো'আর প্রয়োজন এই জন্য যে, খোদার অনুগ্রহ এবং দয়া ব্যতীত কোন ওয়াদা পালন করা কিংবা কোন দাবী পূরণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন এই স্মরণের সাথে ইহাও করিবে যে, সারা দিবসে খোদার যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছ, বিস্তারিতভাবে উহাও হিসাব করিয়া দেখিবে এবং মনে করিবে—আমার এত নাফরমানী সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এত দয়া করিয়াছেন, এত নেয়ামত দান করিয়াছেন, আমি এসমস্ত নাফরমানী হইতে দূরে থাকিলে না জানি কত অনুগ্রহ এবং নেয়ামত দান করা হইবে? ইহার ফলে পরবর্তী দিন হইতেই এবাদতের প্রতি খুব বেশী আগ্রহ জন্মিবে। এই কার্যধারা সর্বদার জন্য স্থির করিয়া লইবে এবং তদনুযায়ী স্থায়ীভাবে আমল করিতে থাকিবে।

ইহার সঙ্গেই আরও একটি খাছ সময় নির্ধারিত করিয়া লইবে। যাহাতে দৈনিক কিছু কিছু যেকের করিবে। ইহার ফলে অন্তর তাজা ও উৎফুল্ল থাকিবে। আত্মার মধ্যে এক রূহানী জীবন অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিবে, কেবল যেকেরই যথেষ্ট নহে; বরং কোন বুযুর্গ লোকের

সঙ্গে সম্বন্ধ এবং সম্পর্কও রাখা উচিত, যাহাতে নফ্‌সের পবিত্রতা সাধন হয় এবং উক্ত বুযুর্গ লোকের সাহায্যে সর্বপ্রকারের পদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সফলতা লাভ করা কঠিন; কোন বুযুর্গের সংশ্রব-সাহচর্যের অভাবে সরল পথ হইতে সরিয়া পড়িয়া বাহুল্য কিংবা ত্রুটিপূর্ণ পথে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা রহিয়াছে। জীবিত বুযুর্গানের মধ্যে কাহারও প্রতি আস্থা না হইলে মৃত বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী এবং কিতাব পাঠ করা উচিত। প্রথমত ইহাতেই ফল হইবে, না হইলে অন্তত আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইবে এবং অবশ্যই ক্রমশ তরীকতের কোন কামেল পীরের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হইয়া সফলতালাভের পথ মুক্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান এবং মোরাকাবা তাহাই যাহা আমি প্রথমে বর্ণনা করিয়াছি। আবার বলিতেছি, সর্বক্ষণ এই ধারণা মনে রাখিবেন যে, আমি এখন আখেরাতের মুসাফির, বহু দূর-দারাযের পথ আমার সম্মুখে। তাহা বড়ই দুর্গম এবং নানাবিধ বিঘ্নসঙ্কুল। ইহার কারণে সফরের পথ বৃথাই দীর্ঘ হইয়া যায়। সুতরাং উক্ত পথের যাবতীয় সহায় ও হিতকর বিষয় অবলম্বন এবং যাবতীয় ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর বিষয় বর্জন করা উচিত।

কিন্তু ইহার সবকিছুই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌ তা'আলা দয়ার দৃষ্টি অর্পণ করিলে সমস্ত মুশ্‌কিল আসান এবং সমস্ত কঠিন কাজ সহজ হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে সহজতম কার্যও কঠিন এবং অসহনীয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং অবশ্যই খোদার দরবারে তওফীক বা সাহায্যের প্রার্থনা করা উচিত। এপথে খোদার সাহায্য এমন বস্তু যে, তরীকতপন্থীরা ইহার চিন্তাই অধিক করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চক্ষু উজ্জ্বল। তাঁহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র দয়া ব্যতীত এ পথে আমাদের চলিবার উপায়ই নাই।

পীরের হাল্‌কা এবং তাওয়াজ্জুহের তথ্য ঃ হযরত মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ

ایں همه گفتیم ولیك اندر پیچ   بے عنایات خدا هیچم وهیچ
بے عنایات حق وخاصاں حق   گر ملك باشد سیاه هستش ورق

"আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার খাছ বান্দাগণের অনুগ্রহ ব্যতীত সমস্ত কামনা-বাসনাই নিস্ফল। ফেরেশ্‌তা হইলেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং মেহেরবানী ব্যতীত সম্মানহীন থাকিবে।" দ্বিতীয় পদে মাওলানা (রঃ) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহলাভের উপায় বলিয়া দিয়াছেন যে, আগে খোদার খাছ বান্দাগণের অনুগ্রহ লাভ কর। ইহাকে বিফল মনে করিও না এবং এরূপ ধারণা করিও না যে, একজন মানুষের অনুগ্রহ লাভ করিলে কি হইবে? বন্ধুগণ! ইহাও খুব হিতকর। অনেক ক্ষতি হইতে রক্ষা করে। তাঁহাদের পরম মনোযোগ ইহাই যে, তাঁহারা নিজেদের মুরীদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ মনোযোগ রাখেন। সর্বক্ষণ তাহাদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং তাহাদিগকে ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপদেশ দান করেন। লাভবান হওয়ার উপায় বলিয়া দেন। মোটকথা, প্রত্যেক সময় তাহাদিগকে দৃষ্টির মধ্যে রাখেন। সম্মুখে আসিয়া বসিলে খাছ দৃষ্টি অর্পণ করেন। ইহাই অনুগ্রহ, ইহাই তাওয়াজ্জুহ।

আমাদের পীর ছাহেবানের প্রতি প্রশ্ন করা হয় যে, তাঁহারা মুরীদগণের প্রতি তাওয়াজ্জুহ্‌ বা অনুগ্রহ দৃষ্টি অর্পণ করেন না। কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারণ করেন না এবং কোন হাল্‌কা মিলাইয়াও বসেন না। কিন্তু ইহারা অজ্ঞ, কিছুই বুঝে না। আমাদের পীর ছাহেবানের তাওয়াজ্জুহ্‌ এবং অনুগ্রহ দৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্বক্ষণ অর্পিত রহিয়াছে। যাঁহারা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া

থাকেন এবং হাল্‌কা মিলাইয়া বসেন, তাঁহাদের মুরীদানের প্রতি কেবল সেই নির্দিষ্ট সময়েই তাওয়াজ্জুহ্ থাকে। আমাদের পীর ছাহেবানের কৃপাদৃষ্টি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গী থাকে। বাস্তবিকপক্ষে তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানের জন্য হাল্‌কা বাঁধিয়া বসা কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের প্রয়োজন নাই। কেহ কি বলিতে পারেন যে, ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াজ্জুহ্ ছিল না? অথচ সেখানে কোন হাল্‌কাও ছিল না এবং তাওয়াজ্জুহ্ প্রদানের নিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত ছিল না। ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বা প্রচেষ্টাও ছিল না। এতদসত্ত্বেও হুযূর (দঃ)-এর তাওয়াজ্জুহ্ সর্বক্ষণ তাঁহাদের অবিচ্ছিন্ন সাথী ছিল। কোন সময়ই তাঁহারা হুযূরের তাওয়াজ্জুহ শূন্য থাকিতেন না। এইরূপে আমাদের পীর ছাহেবানও স্বীয় মুরীদগণকে নির্জনে কিংবা জনতার মধ্যে কখনও তাওয়াজ্জুহ্‌শূন্য রাখেন না। সর্বদা তাহাদের খেয়াল রাখেন।

একজন মেহেরবান ওস্তাদ যেমন সর্বক্ষণ নিজ শাগরেদের খেয়াল রাখেন, সে সম্মুখে বসিয়া বসিয়া পড়িতে থাকিলেও তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বাড়ীতে চলিয়া গেলে পরের দিন বিলম্বে আসিলে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকেন—এত বিলম্বে কেন আসিলে? কোথায় গিয়াছিলে? ইহাতে বুঝা যায় যে, শাগ্‌রেদ বাড়ী যাওয়ার পূর্বে এবং পরেও তাহার প্রতি ওস্তাদের খেয়াল ছিল। মাওলানা রূমী এই কথাটিই স্বীয় মস্‌নবীতে প্রকাশ করিতেছেন ঃ

دست پیر از غائبان کوتاه نیست   قبضه اش جز قبضهٔ الله نیست

“অনুপস্থিত মুরীদগণের জন্য পীরের হাত খর্ব নহে। তাঁহার ধরা যেমন খোদার ধরা। অর্থাৎ, কামেল পীরের তাওয়াজ্জুহ্ নিজের উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বপ্রকারের মুরীদের প্রতি সমান থাকে।”

ফলকথা, পীরের অনুগ্রহ দৃষ্টি ও তাওয়াজ্জুহ্ থাকা একান্ত প্রয়োজন। পীরের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখা উচিত, যাহাতে তাঁহার সর্বপ্রকারের তাওয়াজ্জুহ্ বা অনুগ্রহ দৃষ্টি নিজের প্রতি অর্পিত থাকে এবং তাঁহার আগ্রহ নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু পীরের এই আগ্রহ এবং অনুগ্রহ দৃষ্টি তাঁহার খেদমত করা, পা টিপিয়া দেওয়া এবং হাদিয়া-তোহ্‌ফা প্রেরণের দ্বারা লাভ করা যায় না।

যেমন, কোন ছাত্র যদি নিজের নিঃস্বার্থ শিক্ষকের দরবারে সর্বদা মিঠাই-মণ্ডা লইয়া যায়; দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসে হাদিয়া-তোহ্‌ফা পাঠাইতে থাকে; আবার অষ্টম ও দশম দিবসে তাঁহাকে দাওয়াত করে, কিন্তু পড়ালেখায় বোকা হয়, পরিশ্রম দেখিয়া পলায়ন করে—এমন ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের মহব্বত কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে যে ছাত্র মিঠাই-মণ্ডাও আনে না, দাওয়াতও করে না, উপহার-উপঢৌকনও পেশ করে না, কিন্তু খুব পরিশ্রম সহকারে সবক শিক্ষা করে, সর্বদা লেখাপড়ায় মশগুল থাকে, খেলাধুলাকে ঘৃণা করে, এরূপ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের খাঁটি মহব্বত হইবে এবং তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মিবে। নিজেও পরিশ্রম করিবেন, তাহাকেও পরিশ্রম করাইবেন। তত্ত্বজ্ঞানী পীর ছাহেবানের অবস্থাও এইরূপ। সেই মুরীদকে তাঁহারা কখনও ভালবাসেন না—যাহারা পীর ছাহেবকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দিয়া থাকে, নজরানা পেশ করে; কিন্তু কাজ কিছুই করে না। এরূপ মুরীদের প্রতি তাঁহাদের তাওয়াজ্জুহ্ও হয় না, তাহাদের সংশোধনের জন্য খেয়ালও হয় না। অবশ্য তাঁহাদের তাওয়াজ্জুহ্ সে সমস্ত মুরীদের প্রতিই হইয়া থাকে, যাহারা সত্যের ও আল্লাহ্ তা'আলার অন্বেষণে মশ্‌গুল থাকে।

তাহাদের প্রতিই পীর ছাহেবগণের লক্ষ্য থাকে, যাহাদের অন্তরে খোদার মহব্বত থাকে এবং সত্যিকারের ধ্যান থাকে।

মোটকথা, উপরোক্ত দুই প্রকারের মোরাকাবায় পূর্ণ ফললাভের জন্য ইহাও অপরিহার্য যে, কোন পীরের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত খাছ অনুসরণের সম্পর্ক রাখিতে হইবে। বাইআত হউক বা না হউক, মুরীদ শ্রেণীতে প্রবেশ করুক বা না করুক, শুধু অনুসরণের সম্পর্কই যথেষ্ট। ইন্শাআল্লাহ্! এইরূপে আমল করার পর 'নাজাত' অনিবার্য। উভয় জগতের মঙ্গল এবং মুক্তিলাভের উপায় শুধু ইহাই যে, উল্লিখিত উপায়ে খোদাপ্রাপ্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করিবে, তবে ইন্শাআল্লাহ্ অবশ্যই কৃতকার্য হইবে এবং উদ্দেশ্য সফল হইবে। যেমন, এই রুকূরই শেষভাগে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করিতেছেন : وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ, "যাহারা সত্য অন্বেষণের চেষ্টা করে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়ার বাসনা রাখে, আমি তাহাদের জন্য নিজের পথ মুক্ত করিয়া দেই এবং চলার পথে তাহাদেরকে পথ দেখাই।" দুনিয়ার নিয়ম এই যে, অনেক সময়ে মানুষ পরিশ্রম করে, কিন্তু বিফল হয়, চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কৃতকার্যতার পরিবর্তে অকৃতকার্যতার অবস্থাই দেখা দেয়। পক্ষান্তরে আমার এখানে এরূপ নিয়ম নাই যে, কাহারও পরিশ্রমকে বিফল করিয়া দেই। আমার এখানে কেহ এ বিষয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিলে চাকুরী অবশ্যই পাওয়া যাইবে। নিযুক্তিপত্র আসুক বা না আসুক, কিন্তু পরিশ্রম করা অবধারিত।

ফলকথা, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু চেষ্টা ও পরিশ্রমের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার ফল লাভ করা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে। তিনি স্বয়ং এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ওয়াদা করিয়াছেন : তোমরা আমার জন্য চেষ্টা কর, আমি ইহার ফল অবশ্যই দান করিব। কিন্তু শর্ত এই যে, সেই চেষ্টা শুধু আমার জন্য হইতে হইবে।' فينا, শব্দে তাহাই বুঝা যায়। তাহাতে দুনিয়া অন্বেষণের গন্ধও না থাকা চাই। অন্যথায় চেষ্টার ফলে যদি হেদায়ত এবং আল্লাহ্র পথ লাভ না হয়, তবে বিচিত্র কিছুই মনে করিও না। কেননা, আমার ওয়াদা কেবল তখন পর্যন্তই, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সত্য অন্বেষণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি তোমরা দুনিয়ার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা জান আর তোমাদের কাজে জানে। ইহার সহিত আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। দুনিয়ার অন্বেষণে আমি কখনও তোমাদের সহায় ও সাহায্যকারী নহি। কেননা, দুনিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ। নিকৃষ্ট পদার্থের অন্বেষণে আমি তোমাদের সাহায্যের ওয়াদা কেমন করিয়া করিতে পারি? যে দুনিয়াকে খেল-তামাশা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এখানে তাহাই উদ্দেশ্য। তাহা নিন্দনীয় বটে; প্রশংসনীয় নহে।

দুনিয়ার প্রকারভেদ : আমার উপরোক্ত বর্ণনার প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আপনি তো বলিলেন : দুনিয়া তলব করা নিন্দনীয়, অথচ ওহুদের যুদ্ধে হযরত নবী করীম (দঃ) কতিপয় ছাহাবাকে ওহুদ পর্বতের গিরিপথ রোধ করিয়া থাকার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কোন অবস্থাতেই ইহা ত্যাগ করিবার অনুমতি ছিল না। কিন্তু কাফের সৈন্য পলায়ন আরম্ভ করিলে তাঁহারা গনীমতের মাল লাভ করার জন্য হুযূরের আদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গিরিপথ ত্যাগ করত গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য দৌড়াইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শত্রু-সৈন্য যখন পলায়ন করিয়াছে, তখন আমাদের আর এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? গনীমতের মাল কেন হারাই? তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا

"তোমাদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা দুনিয়া অন্বেষণ করে।" ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা দুনিয়া তলবকারী ছিলেন। তবে কি ছাহাবায়ে কেরামকে নিন্দনীয় কাজের তলবকারী বলা হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, দুনিয়া দুই প্রকারঃ নিন্দনীয় এবং প্রশংসনীয়। নিন্দনীয় দুনিয়া অন্বেষণ করাও নিন্দনীয়। কেননা, এস্থলে দুনিয়ার জন্যই দুনিয়া তলব করা হয়। আখেরাতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আখেরাত হইতে বহুদূরে। কিন্তু প্রশংসনীয় দুনিয়া আখেরাতের নিকটবর্তী, ইহার অন্বেষণ করাও প্রশংসনীয়। কেননা, এই দুনিয়া আখেরাতের জন্যই তলব করা হয়। যে দুনিয়া ছাহাবায়ে কেরাম তলব করিয়াছেন বলা হইয়াছে, তাহা আখেরাতের জন্য ছিল। মালে গনীমত লাভ করিয়া যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিবেন এবং তদ্দ্বারা ইস্‌লামের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেদের অবস্থা শোধরাইয়া নিবেন আর ইস্‌লামের শক্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধি করিবেন। কোরআন শরীফে শুধু يُرِيْدُ الدُّنْيَا "দুনিয়া তলব করে" বলা হইয়াছে। কিসের জন্য তলব করেন, তাহা বলা হয় নাই, কিন্তু ছাহাবাদের (রাঃ) অবস্থা হইতে তাঁহাদের তলব আখেরাতের জন্য ছিল বলিয়া বুঝা যায়। অতএব, প্রশ্নের জবাব হইয়া গেল।

ইহার উপর যদি আবার প্রশ্ন করা হয় যে, তবে তাঁহাদিগকে ধমক কেন দেওয়া হইল? তাঁহাদের দুনিয়া অন্বেষণ তো নিন্দনীয় ছিল না? তবে বলিব, ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা হুযূর (দঃ)-এর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিজের মতানুযায়ী কাজ কেন করিলেন? এই কারণেই তাঁহাদিগকে ধমক প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহারা নিন্দনীয় দুনিয়া অন্বেষণ করিয়াছিলেন—সে জন্য নহে।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার জন্য পরিশ্রম কর। আমার নিকট পৌঁছিবার জন্য আমি তোমাদের পথ প্রদর্শন করিব। এই আমার ওয়াদা। اِنَّ اللهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।" খোদার দয়া, এত বড় ওয়াদা করিলেন যে, তোমরা কেবল চেষ্টা কর, উদ্দেশ্য সফল করিয়া দেওয়া আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমাদের সঙ্কীর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পাছে আমরা এত বড় ওয়াদা শ্রবণ করিয়াও নিশ্চিন্ত না হই। সুতরাং আমাদের শান্তির জন্য নিজের ওয়াদায় কতকগুলি 'তাকীদ' অর্থাৎ, নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অব্যয় সংযোগ করিয়াছেন। প্রথমে 'লামে তাকীদ' শেষে 'নূনে সকীলাহ্।' আবার বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের ভাষায়ও ক্ষমতাধীন বিষয়ের ওয়াদায় বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হয়।

আর একথার প্রতিও এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, "আমি এমন কাজ করিতে পারি, যাহা একদল লোক একত্রিত হইয়াও করিতে পারে না।" কখনও তোমাদের এরূপ কল্পনা হইতে পারে যে, চেষ্টা ও পরিশ্রমকারীর সংখ্যা তো শত শত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা একাকী সকলকে কিরূপে পথ দেখাইবেন? অবশ্য কোন ঈমানদার মুসলমান এরূপ কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু কল্পনা পথে ইত্যাকার সন্দেহ আসিয়া পড়ে। তাহা দমনের জন্য এখানে বহুবচনের রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদিও আমি একা; কিন্তু আমি একাই এমন কাজ করিতে পারি, সারা জগত একত্রিত হইয়া যাহা করিতে পারে না।

আয়াতের سُبُلَنَا শব্দ হইতে তাসাওউফের একটি মাস্‌আলার প্রতি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা এইঃ طَرِيْقُ الْوُصُوْلِ اِلَى اللهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ, "সমস্ত সৃষ্টজীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা যত, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছিবার পথসমূহের সংখ্যা তত।" কেননা, এখানে سُبُلَنَا শব্দটি বহুবচন। ঐদিকে نَهْدِيَنَّ 'পথ দেখাইব' ক্রিয়ার কর্মও বহুবচনের সর্বনাম।

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়ঃ সুতরাং বহুবচনের মোকাবেলায় বহুবচনের শব্দ ব্যবহারে বুঝা গেল, আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছিবার পথ শুধু একটি নহে; বরং বহুসংখ্যক পথ রহিয়াছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক পৃথক পথ রহিয়াছে। যেমন, ব্যবস্থাপত্রে লিখিত ঔষধের যাবতীয় অংশ মূলত এক; কিন্তু ডাক্তার রোগীর স্বভাবের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ-কম করিয়া কিংবা উল্টা-পাল্টা করিয়া বিভিন্ন রোগীর জন্য বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। আবার কোন রোগীর জন্য এই ঔষধগুলির সঙ্গে يدرقه ব্যবহারের নিয়মাবলীরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আবার কোন রোগীকে শুধু ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। মোটকথা, যাবতীয় অংশের মূল একই। কিন্তু চিকিৎসক রোগীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দিয়া থাকেন। এইরূপে শরীঅতেরও মূল উদ্দেশ্য এক, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দরবার পর্যন্ত পৌঁছা। কিন্তু কোন কোন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার পথ বিভিন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, হযরত হাজী ছাহেবের (রঃ) নিকট এক রোগী আসিয়া আরয করিলঃ হুযূর, আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আফসোস্! 'মসজিদে হারামে' নামায পড়িতে পারি নাই। তিনি তাহার জন্য আরোগ্যের দো'আ করিয়া বিদায় করিলেন। সে চলিয়া যাওয়ার পর বিশিষ্ট লোকদের মজলিস অবশিষ্ট রহিল। তিনি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌ওয়ালা হইলে কখনও অস্থির হইত না। কেননা, 'হরম' শরীফে নামায পড়াও যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছিবার এক পথ, তদ্রূপ ওযরের সময় ঘরে নামায পড়িয়া হরমের জন্য ব্যাকুল থাকাও আর এক পথ। এই কারণে আল্লাহ্‌ওয়ালার দৃষ্টিতে উভয় অবস্থাই আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার সমান উপায়। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ শুধু আল্লাহ্‌র সন্তোষই কামনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু নামায আদায় করা। মস্‌জিদে হারামে সম্ভব হইলে তথায় আদায় করিতেন, ওযর কিংবা রোগবশত তথায় সম্ভব না হইলে ঘরে পড়িয়া লইতেন।

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবার রাস্তা বিভিন্ন। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন পথের ব্যবস্থা। এই কারণেই তরীকতের পীর (আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসক) এবং হাকীম (দৈহিক রোগের চিকিৎসক) যোগ্যতা অনুযায়ী কোন একটি পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। যাহাতে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত সহজে পৌঁছিতে পারা যায়। যেমন, মক্কা শরীফে যাওয়ার পথ বোম্বাই হইয়াও আছে, করাচী হইয়াও আছে। পথ পৃথক হইলেও গন্তব্যস্থান একই। যেদিক ইচ্ছা সেদিক দিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা একমাত্র উদ্দেশ্য, তবে ইহার পথ বিভিন্ন।

পীরের দরবারে কোন মুরীদ আসিলে তিনি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, অন্যান্য ওযীফা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত ইহার জন্য অধিক হিতকর হইবে, তিনি তাহাকে ইহাই বলিয়া দেন। অপর মুরীদ আসিলে দেখিলেন, ইহার মধ্যে অহংকার রোগ আছে, তখন যাহাতে অহংকার দূর হয়, তাহার জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অহংকার দূর করারও আবার বিভিন্ন উপায় আছে। দেখুন, সড়ক ঝাড়ু দেওয়ান অহংকার দূর করার একটি পন্থা। তদ্রূপ নামাযীদের জুতা সোজা করিয়া দেওয়াও আর একটি পন্থা। উভয় পন্থায়ই অহংকার দূর করা যায়। মোটকথা, পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থান একই।

অতঃপর সম্মুখের দিকে ইহার ফলকথা বলিতেছেনঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ "নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা নেক্‌কার বান্দাগণের সঙ্গে আছেন।" এই বাক্যটি সংযোগে আয়াতের সারমর্ম এই হয়,

তোমরা আমার নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী আমল করিতে থাক, চেষ্টা ও পরিশ্রমে সাহস হারাইও না। ইহাতে তোমরা নেক্‌কারদের শ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর ইহার ফল এই পাইবে যে, নেক্‌কার বান্দাগণকে আমি আমার সঙ্গরূপ মহাধন দান করিব। সঙ্গ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে اِنَّ اللهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক স্বয়ং আসিয়া নেক্‌কারদের সঙ্গী হইবেন। اِنَّ الْمُحْسِنِيْنَ لَمَعَ اللهِ অর্থাৎ, নেককারগণ আল্লাহ্‌র সঙ্গী হইবেন বলেন নাই। ইহাতে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যদ্যপি আমার নিকট পৌঁছিবার ইহাও একটি পন্থা যে, তোমরা আসিয়া আমার সহিত মিলিত হও, কিন্তু তাহা তোমাদের ক্ষমতার বাহিরে। যেমন কবি বলেনঃ

نگـردد قطع هرگــز جادهٔ عشق از دويـــدنهــا
كه مى بالد بخـود ايں راه چوں تاك از بريدنها

"এশ্‌কের পথ দূরত্ব অতিক্রমে কমে না; বরং আঙ্গুরের লতার ন্যায় কর্তিত হইয়াও বাড়িতে থাকে।" অতএব, আমি দ্বিতীয় পন্থার ব্যবস্থা করিয়াছি, আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া নেক্‌কারদের সহিত মিলিত হইব।

এখন নেককারদের স্বরূপ বুঝিয়া লউন। প্রথমে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا বাক্যে ইঁহাদেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। اِحْسَانٌ অর্থাৎ, নেক কার্যের স্বরূপ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে— اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ অর্থাৎ, এমন সুন্দরভাবে ও আদবের সহিত আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে, যেন তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া এবাদত করিতেছ। ইহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, আমরা যখন তাঁহাকে দেখিতেই পাই না, তবে এরূপ অবস্থার ফল আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি? সঙ্গে সঙ্গেই হুযূর (দঃ) ইহার উত্তর দিয়াছেনঃ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ "যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও না, তিনি তো তোমাকে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন।" শাসিত ব্যক্তি শাসককে দেখার যে ফল, শাসক শাসিতকে দেখারও সেই ফল। অর্থাৎ, একজন শাসিত ব্যক্তি যেমন স্বীয় শাসককে দেখিয়া খুব আদব ও নম্রতা সহকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয় এবং যাবতীয় কার্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করে, তদ্রূপ তুমিও স্বীয় আহ্‌কামুল হাকেমীন খোদার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিশয় ভয় ও বিনয় সহকারে এবাদত কর। ইহা প্রথম বাক্যের অর্থ।

এখানে যদি বলা হয় যে, দুনিয়ার শাসক আমাদের চোখের সামনে দাঁড়ান থাকিলে তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া ভয়ে খুব সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করি, কিন্তু খোদাকে যখন আমরা দেখিতে পাই না, তখন আমরা মনে সেই ভয় কেমন করিয়া আনয়ন করিব?

হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যে ইহার উত্তর রহিয়াছে। তোমাদের এবাদতের পরিপাট্য এবং আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উপরোক্ত উপায়ের ন্যায় আরও একটি উপায় আছে। অর্থাৎ, খোদা তা'আলা তোমাদিগকে দেখাই যথেষ্ট। তিনি তোমাদিগকে সকল অবস্থায় দেখিতে পান। একথার প্রতি তোমাদের বিশ্বাসই তো রহিয়াছে। তোমরা সর্বদা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছ, ইহাও তোমরা বিশ্বাস কর। সুতরাং যদিও তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও না, কিন্তু তোমাদের এবাদত যাঁহাকে দেখান উদ্দেশ্য, তিনি তো তোমাদিগকে দেখিতেছেন বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস আছে। কাজেই পূর্ণ ধীরস্থিরভাবে পরিপাট্যের সহিত নিজের কাজ করা উচিত।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন, কোন চাকরের যদি জানা থাকে যে, প্রভু পর্দার অন্তরাল হইতে আমার কার্য দেখিতেছেন। চাকর যদিও তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তথাপি সে তাহার যাবতীয় কার্য তদ্রূপ সাবধানতার সহিত করিবে, যেরূপ সে মনিব সম্মুখে থাকিলে করিত এবং তদ্রূপ

ভয়-ভীতিও থাকিবে, যেমন সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে হইত। এহ্‌সান (احسان) -এর সারমর্ম ইহাই। এই এহ্‌সানকে 'মুজাহাদা' বা চেষ্টা ও পরিশ্রম নামে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, চেষ্টা ও পরিশ্রমই সেই এহ্‌সানের দরজা প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। বস্তুত 'মুজাহাদা'র অর্থ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম ও সাধনা করা, কিন্তু এখানে সেই অর্থ উদ্দেশ্য নহে। কেননা এহ্‌সানের স্বরূপ যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রথম দিনেই হাছিল হইতে পারে; অবশ্যই হাছিল হইতে পারে। কেননা, اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণের অবস্থা দেখিতেছেন" বলিয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই বিশ্বাস রহিয়াছে। কেবল ইহা স্মরণ রাখার প্রয়োজন আছে এবং এই স্মরণ রাখা নফ্‌সের আযাদীর বিরোধী বলিয়া তাহার উপর কষ্টকর হইয়া থাকে—ইহাই 'মুজাহাদা'।

অতএব, শুধু একথার জন্যই আফসোস, আমরা আকীদা ও বিশ্বাসকে শুধু জ্ঞানলাভের জন্যই রাখিয়া দিয়াছি। আমলের ক্ষেত্রে ইহা দ্বারা কোন কাজ লইতেছি না। এই কারণেই আমাদের এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে। বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিলে 'হাল' উৎপন্ন হইবে। অতঃপর উক্ত অবস্থার মধ্যে দৃঢ়তা জন্মিয়া এমন এক স্বাদ পাইতে থাকিবে যে, কখনও আমল বাদ পড়িবে না, আমলে কখনও তৃপ্তিও হইবে না—যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছিয়াও যায়। যেমন, কবি বলেন ঃ

دل آرم در بـــر دل آرم جوئے　　لب از تشنگی خشـك بر طرف جوئے
نه گويـــم كه بر آب قادر نيـــنـــد　　كه بر ساحـل نيـل مستسقى انـد

"মাহ্‌বুব হৃদয়ে অথচ তাঁহার অন্বেষণ চলিতেছে। নদীর পাড়ে থাকিয়াও তৃষ্ণায় ঠোঁট শুষ্ক। এমন নহে যে, পানি পাইতেছে না। কিন্তু 'এস্তেস্কা' রোগের রোগীর ন্যায় নীল নদের তীরে থাকিয়াও পিপাসা থাকিয়াই যায়।"

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে দো'আ করিতেছি, সেই মহাশক্তিমান চিরঞ্জীব আমাকে এবং আপনাদিগকে তওফীক দান করুন, যেন আমি ও আপনারা ইহার উপর আমল করিতে পারি। আমীন!

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

—■—

নিজ বাড়ী
১৩৪৫ হিজরী ৫ই যিল্‌কা'দ,

হাম্মুল আখেরাহ্

[পরকালের চিন্তা]

■

শুধু দুনিয়ার লোভ নিন্দনীয় নহে; বরং তদনুযায়ী কাজ করা নিন্দনীয়। এইরূপে ধন-সম্পদের অনুরাগও সর্বস্তরে নিন্দনীয় নহে; বরং ইহার কোন স্তর কাম্যও বটে। যেমন, যে পরিমাণ অনুরাগে মালের হেফাযতের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় তাহা কাম্য। কেননা, মাল বিনষ্ট করা হারাম। এতটুকু অনুরাগ না থাকিলে মানুষ মালের প্রতি কোনই মর্যাদা দান করিবে না, এবং উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে, অথচ শরীঅতে তাহা নিষিদ্ধ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا
هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ -
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ ○

মহান ভবিষ্যদ্বাণী

আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম, ইহা সূরা-রূম-এর একটি আয়াত। ইতিপূর্বে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, ভবিষ্যদ্বাণী এমন লোকের মুখ হইতে বাহির হওয়া, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীর কোন উপকরণ লাভ করেন নাই এবং নবুওয়তের দাবী করেন। আবার ভবিষ্যদ্বাণীও অবিকল ঘটিয়া যায়। ইহা অদৃশ্য জগতের সহিত তাঁহার যোগাযোগের নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণীর পরমুহূর্তে তদনুযায়ী ঘটনা ঘটিলে ইহা তাঁহার মো'জেযা বলিয়া গণ্য হইবে। বিশেষত ইহা এমন সাধারণ বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নহে, যাহা ডাক্তারগণ বাহ্যিক লক্ষণদৃষ্টে জানিতে পারে। বস্তুত আজকাল কোন কোন মূর্খ লোক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তি এত দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে কিংবা অমুক ব্যক্তি অমুক রোগে আক্রান্ত হইবে; বরং ইহা এমন ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার সম্পর্ক

দুই রাজ্যের সহিত। আর সম্বন্ধও এমন বিচিত্র যাহা বাহ্যজ্ঞানের বিপরীত ও বর্তমান লক্ষণসমূহ হইতে দূরবর্তী। আবার ভবিষ্যদ্বাণীও গোলমেলে নহে; বরং স্পষ্টভাবে সময় নির্ধারণ করত দাবী করা হয় যে, এখন যে রাজ্য জয় লাভ করিয়াছে, কয়েক বৎসর পরে ইহারা পরাজিত হইবে এবং পরাজিত রাজ্য তখন জয় লাভ করিবে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা ঘটিয়াও গেল। সুতরাং, ইহা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের সত্যতার নিদর্শন। নবুওয়তের সিল্‌সিলা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রকারের নিদর্শনে নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ হইত। নবুওয়ত সমাপ্ত হওয়ার পর কেহ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিলে তাহা যদি ভুল প্রমাণিত নাও হয়, তথাপি সে ব্যক্তিকে নবী বলা যাইবে না এবং ইহাও নবুওয়তের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং তিনি যদি শরীঅতপন্থী ওলী হন, তবে ইহা তাঁহার কারামত বলিয়া গণ্য হইবে। শরীঅতপন্থী না হইলে ইহাকে 'এস্তেদ্‌রাজ' বলা হইবে। এখানে যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ভবিষ্যৎ বক্তা যদি নবুওয়তের দাবীও করে এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ভুলও না হয়, তথাপি কি তাহা নবুওয়তের নিদর্শন হইবে না?

তবে উত্তর এই দেওয়া যাইবে যে, ইহার সম্ভাবনা শুধু আনুমানিক এবং বাস্তববিরোধী। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা করিলে এরূপ করিতে পারেন এবং এরূপ আনুমানিক সম্ভাবনা প্রকৃত ব্যাপারের জন্য হানিজনক নহে। এই প্রশ্নটি ঠিক সেইরূপ, যেমন এক শাগ্‌রেদ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যিনি পাঠের সময় সর্বদা নীরব থাকিতেন।

একদিন ইমাম ছাহেব বলিলেনঃ ভাই, তুমি কখনও কোন প্রশ্ন কর না, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিও। সে বলিলঃ আচ্ছা, এখন হইতে জিজ্ঞাসা করিব। একদিন ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) মাস্‌আলা বর্ণনা করিলেনঃ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফ্‌তার করা উচিত। তখন উক্ত শাগ্‌রেদ জিজ্ঞাসা করিলঃ হুযূর! যদি কোন দিন সূর্য অস্তমিতই না হয়, তবে কি করা হইবে? ইমাম ছাহেব হাসিয়া বলিলেনঃ ভাই, তোমার নীরব থাকাই ভাল।

অতএব, এই শাগরেদের প্রশ্নের ভিত্তি যেমন শুধু মনে করা এবং ধরিয়া লওয়ার উপর ছিল, তদ্রূপ আলোচ্য প্রশ্নের ভিত্তিও শুধু মানিয়া লওয়ার উপর। এরূপ অনুমান ও সম্ভাবনা লক্ষণীয় নহে। যদি অসম্ভব কিছু মানিয়া লওয়ার মত ইহাকে মানিয়াও লওয়া হয়, তবে উত্তর এই হইবে যে, ইহা তখনই নবুওয়তের আলামতরূপে গণ্য হইবে, যদি কোন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নবুওয়ত প্রমাণ হইয়া থাকে। অন্যথায় উহা আলামত বলিয়া গণ্য হইবে না।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা অলঙ্ঘনীয়ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে খুব উচ্চ পর্যায়ের একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ وَعْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও ওয়াদা খেলাফ করেন না।" সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক ঠিকভাবে ঘটিয়া যাওয়ার ফলে সমস্ত মানুষ হুযূর (দঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তবুও বহু লোক অবিশ্বাসী রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে ইহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেনঃ

وَعَدَ اللّٰهُ لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○

ইহার সর্বশেষ বাক্যটিতে অভিযোগ করিতেছেন, "অধিকাংশ মানুষ খবরই রাখে না" (যে, মু'জেযাসমূহ নবীর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ। বস্তুত ভবিষ্যদ্বাণীও গায়বী সংবাদ বলিয়া মু'জেযাবিশেষ) খবর না রাখার অর্থ এই যে, ইহারা একথার প্রতি বিশ্বাসই করে না কিংবা বিশ্বাস

থাকিলেও তদনুযায়ী আমল করে না। যেহেতু এলমের জন্য আমল অপরিহার্য, যদিও আমল কেবল অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক, কাজেই আমল না থাকিলে এল্‌মও নাই বলিয়া বুঝা যায়। বস্তুত কাফেরদের মধ্যে আমল কোন পর্যায়েই নাই। কাজেই বলিয়াছেন لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, "তাহারা খবরই রাখে না।" এখানে প্রশ্ন হইতে পারিত যে, অনেক মুসলমান নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, কিন্তু ইহা ফরয বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে কি আমল করে না বলিয়া ইহাদেরও এল্‌ম বা বিশ্বাস নাই বলিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যই আমি "যদিও আমল অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক" কথাটি সংযোগ করিয়াছিলাম। অর্থাৎ, আমলকে অপরিহার্য কর্তব্য মনে করাও আমলের এক পর্যায় বটে। মুসলমান যদিও আমল করে না, কিন্তু আমলকে ফরয বলিয়া অপরিহার্যরূপেই বিশ্বাস করে; কাফেররা তাহাও করে না। মোটকথা, যাহাদের এই বিশ্বাস থাকিবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী 'মু'জেযা এবং মু'জেযা নবুওয়তের আলামত। তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অবশ্যই ঈমান রাখিবে এবং ইহাই আমল বলিয়া গণ্য। কেননা, ঈমান অন্তরের আমল। অতএব, ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ব হইতে ঈমান থাকা বশত ভবিষ্যৎ বক্তা নবী (দঃ)-এর প্রতি নিশ্চয়ই ঈমান ও বিশ্বাস জন্মিবে। এই পর্যায়ে ঈমান ও আমলের অপরিহার্য সম্পর্ক সাব্যস্তই হইল।

অবশ্য মুখে ঈমান প্রকাশ করা ঈমানের অংশ নহে। কেননা, অন্তরের বিশ্বাস আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যস্থিত সম্পর্ক। মুখে প্রকাশ করা ঈমানের জন্য শর্ত কিনা, ইহাতে দার্শনিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সঠিক মত এই যে, মুখে প্রকাশ না করিলে শুধু গুনাহ্ হইবে, যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুখে প্রকাশ না করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট সে মু'মেনই থাকিবে, কিন্তু গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত হইবে।

মানুষের নিকট এবং দুনিয়ার বিচারে সে মু'মেন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুখে স্বীকার করা শর্ত। কেহ মুখে নিজেকে মুমেন বলিয়া স্বীকার না করা পর্যন্ত আমরা তাহাকে কাফেরই বলিব। বিশেষত যখন সে মুখে স্বীকার করার ক্ষমতাও রাখে। মক্কার কাফেররা তো অক্ষম এবং পরাভূত ছিল না; বরং মুসলমানরাই তাহাদিগকে ভয় করিত। এমতাবস্থায় আমরা তাহাদের অন্তরে ঈমান থাকার সম্ভাবনা কিরূপে মনে করিতে পারি? যদিও মানিয়া লওয়া যায় যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও অন্তরে ঈমান ছিল। তথাপি হুযুর (দঃ) এবং মুসলমানদের সহিত তাহাদের ব্যবহার ঈমান অস্বীকৃতিরই পরিচায়ক ছিল। যেমন, কোরআন শরীফ অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করা উহার প্রতি অস্বীকৃতির চিহ্ন। এইরূপে রাসূল (দঃ)-কে কষ্ট দেওয়া এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাও অবিশ্বাসের আলামত। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের সেই অন্তরস্থ বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও ধর্তব্য হইবে না। কেননা, আল্লাহ্‌র নিকট মু'মেন হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নহে; বরং অবিশ্বাসের কোন আলামত না থাকাও শর্ত।

এখন আমি তালেবে এল্‌ম সুলভ একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি। প্রশ্নটি এই, কোন কোন আয়াতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত সম্বন্ধে কাফেরদের এল্‌ম ছিল। যেমন, আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ "তাহারা কি তাহাদের রাসূলকে চিনে না, যে কারণে তাহারা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতেছে?" এখানে প্রশ্নটি নেতিবাচক বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নবুওয়ত সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল। অন্যত্র তিনি কিতাবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরিষ্কার বলিয়াছেনঃ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

"তাহারা নবী (দঃ)-কে সেইরূপই চিনে যেমন তাহাদের পুত্রদেরকে চিনে।" অতএব, দেখুন, নবীর পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। বাধ্যতামূলক বিশ্বাসকে ঈমান বলা যায় না। ইচ্ছাকৃত কার্যকেই ঈমান বলে।

اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও ইহার ফলাফলঃ বাধ্যতামূলক জ্ঞান-বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত যেমন, রৌদ্র দেখিয়া প্রত্যেকেই ইহাকে সূর্যের আলো বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এইরূপে হুযূর (দঃ)-কে দেখিয়া প্রত্যেক দর্শকই তাঁহার নবুওয়তে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইত। তথাপি সকল মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। আর আল্লাহ্‌র তওহীদে বিশ্বাস করিতে তো সকলেই বাধ্য। প্রকৃতিপূজক, নাস্তিক, কাফের সকলের মনেই তওহীদের বিশ্বাস রহিয়াছে। ইহা اَلَسْتُ প্রতিশ্রুতিরই প্রতিক্রিয়া। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের হেকমত সম্বন্ধে বলিয়াছেনঃ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّاكُنَّا عَنْ هٰذَا غٰافِلِيْنَ অর্থাৎ, "এই প্রতিশ্রুতি আমি এই জন্য গ্রহণ করিয়াছি, যেন তোমরা কিয়ামতের দিন বলিতে না পার যে, আমরা ইহা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম।" অতএব, বুঝা গেল, এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরে তওহীদ সম্বন্ধে আর কেহ অজ্ঞ থাকে নাই। ইহার মূল বিষয়টি সকলেরই স্মরণ আছে। কেহ বলিতে পারেন, "কৈ, সেই প্রতিশ্রুতির কথা আমাদের তো স্মরণ নাই?" আমি বলিব, স্মরণ থাকার অর্থ ইহা নহে যে, সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ এবং বিশেষ ঘটনাও স্মরণ থাকিবে। অর্থাৎ, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ জায়গায় এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল? তখন ডানে ও বামে কে ছিল? বরং স্মরণ থাকার অর্থ এই যে, মূল বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্মরণ থাকা।

দেখুন, آمَدَنْ শব্দের অর্থ—'আগমন করা' آمَدْنَامَهْ কিতাব যাহারা পড়িয়াছে সকলেরই ইহা স্মরণ আছে। কিন্তু কোন্‌ ওস্তাদের নিকট কোন্‌ দিন কোন্‌ জায়গায় কিরূপে পড়িয়াছে সেই তফ্‌সীল স্মরণ নাই। কচিৎ কাহারও স্মরণশক্তি অত্যধিক প্রবল হইলে যদি কেহ বিস্তারিত বিবরণসহ স্মরণ রাখিয়া থাকে, তবে اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। বস্তুত কোন কোন কাশফের অধিকারী আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকেরও اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণসমূহ স্মরণ ছিল।

এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ আমাদের নিকট হইতে যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে, তাহা আমার খুব স্মরণ আছে। আল্লাহ্‌ পাক যখন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলিলেন, তখন আত্মাসমূহ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহের দিকে তাকাইয়াছিল যে, "হুযূরই প্রথমে জবাব দিন, অতঃপর আমরা সকলে জবাব দিব।" হুযূর সর্বপ্রথম بَلٰى হাঁ বলিলেন। অতঃপর সকলেই بَلٰى হাঁ বলিল।

আর এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ হাদীস শরীফে আছে,

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ

অর্থাৎ, "আত্মাসমূহকে সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত করা হইয়াছিল। সেখানে যাহাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হইয়াছিল—ইহলোকে আসিয়া তাহারা পরস্পর বন্ধু হইয়াছে। আর যাহাদের মধ্যে তথায় পরিচয় হয় নাই, ইহলোকে তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে।"

উক্ত বুযুর্গ লোক বলেন, সেখানে পরস্পর পরিচয় হওয়া এবং না হওয়ার অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল যে, যখন আত্মাসমূহকে একত্রিত করা হইয়াছিল, তখন কোন কোন আত্মা পরস্পর

মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব হইয়াছে। আবার কেহ কাহারও পিঠের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহার মুখ অপরের পিঠের দিকে ছিল, তাহার মনে অপরের প্রতি বন্ধুত্ব হইয়াছে এবং যাহার পিঠ অপরের দিকে ছিল, তাহার মনে অপরের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। আবার কেহ কেহ পরস্পরের প্রতি পিঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মনেই উভয়ের প্রতি ইহলোকেও ঘৃণা জন্মিয়াছে। এই বুযুর্গ লোক তাঁহার সহচরবৃন্দের নিকট বলিতেনঃ তখন অমুক আমার ডান দিকে এবং অমুক আমার বাম দিকে ছিল।

এইরূপে হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন (রঃ) বলিয়াছেনঃ প্রথমে যখন রূহকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল, তখন রূহ আল্লাহ্‌র সেই আদেশ শ্রবণ করিয়াছে। তিনি ইহাও বলিতেন যে, আল্লাহ্ যেই লাহানে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহাও আমার স্মরণ আছে। কেহ কেহ-ইহাও বলিয়াছেন যে, সেই লাহানের মাধুর্যে মত্ত হইয়াই রূহ্ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা সেই দেহ, যাহাতে রূহ্‌কে প্রবেশ করাইয়া— أَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল।

কেহ বলিতে পারেন, আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে মুক্ত। যেমন, হযরত শেখ ফরীদউদ্দীন আত্তার বলেনঃ قول او را لحن نے آواز نے “আল্লাহ্‌র কালামের লাহানও নাই, শব্দও নাই।” তবে রূহ তাহা শ্রবণ করিল কিরূপে?

কোন কোন নীরস বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক শেখ ফরীদউদ্দীনকে ‘শেখ’ মনে করিতেন না; বরং শুধু গোঁড়া সূফী মনে করিতেন। কেননা, আল্লাহ্ তা’আলার একত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন কোন কবিতা একটু বেশী তেজস্কর ছিল। যাহাতে বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাঁহার পরিভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার কারণে ধোঁকায় পতিত হইয়াছিলেন। হযরত শেখ ফরীদের একটি অতি দীর্ঘ কাসীদা আছে। তন্মধ্যে প্রথম কবিতাটি এইঃ

چشم بکشا که جلوهٔ دلدار - متجلی ست از در و دیوار

“চক্ষু খুলিয়া দেখ, মাহ্‌বুবের জ্যোতি ঘর ও দেওয়াল হইতে বিকীর্ণ হইতেছে।”

শেখ ফরীদ সম্বন্ধে তাহাদের এই ধারণা ভুল। তিনি বড় তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ ছিলেন। মাওলানা রূমী তাঁহার খুবই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ

هفت شهر عشق را عطار گشت - ماهنوز اندر خم يك كوچه ايم

“আত্তার এশ্‌কের সাতটি শহর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি ইহার একটি গলির মোড়েই রহিয়া গিয়াছি।”

তিনি খোদাপন্থীদের সংশোধক এবং অভিভাবকও ছিলেন। তাঁহার ‘পান্দেনামা’ কিতাবেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কিতাবেই তিনি কবরপূজকদের প্রতিবাদে বলিয়াছেনঃ

در بلا یاری مخواه از هیچ کس - زانکه نه بود جز خدا فریاد رس

“বিপদের সময় কাহারও নিকট হইতে বন্ধুত্বের আশা করিও না। ঐরূপ সময়ে খোদা ভিন্ন কেহ সাহায্যকারী নাই।”

এমন লোক তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কিরূপে হইতে পারেন? এই তো হইল তাঁহার উক্তি; তওহীদ এবং শিরক সম্বন্ধীয় আমল ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য দেখুন, قول او را لحن نے آواز نے

"আল্লাহ্‌ তা'আলার কালামে লাহানও নাই শব্দও নাই", ইহা সম্পূর্ণরূপে সুন্নী সম্প্রদায়ের মত। তবুও তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানশূন্য কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

আল্লাহ্‌র কালাম স্বর হইতে পবিত্র ঃ মোটকথা, হযরত শেখ ফরীদের ন্যায় এমন একজন মহান তত্ত্বজ্ঞানীর মতে আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম স্বর হইতে মুক্ত। দার্শনিক ওলামায়ে কেরামও এসম্বন্ধে একমত। এতদসত্ত্বেও হযরত নেযামুদ্দীন রাহেমাহুল্লাহ্‌র উক্তির কি অর্থ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে আল্লাহ্‌র কালামের তাজাল্লী মানুষের কালামের সাদৃশ্য পরিগ্রহণ করিয়াছিল এবং সাদৃশ্যময় কালামে একটি স্বর সমন্বিত ছিল। তূর পর্বতের বৃক্ষের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার তাজাল্লীও তদ্রূপই ছিল বলিয়া বৃক্ষ হইতে আওয়ায আসিতেছিল। বস্তুত উক্ত আওয়াযও আল্লাহ্‌র কালামের আওয়ায ছিল না; বরং পরিগ্রহণকারী তাজাল্লীরই ফল ছিল। উহার ফলে বৃক্ষের মধ্যে আওয়ায উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে কালামের তাজাল্লীও ঠিক সেইরূপই বটে। বলাবাহুল্য, যদিও সাদৃশ্য পরিগ্রহণমূলক তাজাল্লী আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকৃত গুণ নহে, কিন্তু অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থরাজির তুলনায় আল্লাহ্‌র গুণের সহিত ইহার এক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং, পরোক্ষভাবে উহাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলা ঠিক হইতেছে। এতদ্ভিন্ন উহাতে প্রকৃত কালামে এলাহীর যথার্থ লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে, তন্মধ্যে একটি লক্ষণ ইহাও যে, উহাতে অসীম ও অনুপম স্বাদ পাওয়া যায়। কেননা, যথার্থ কালামে এলাহীর সাথে ইহার চরম পর্যায়ের নৈকট্য রহিয়াছে। যাহাহউক, আশা করি, ইহাতে প্রশ্নের উত্তর হইয়া গিয়াছে। হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন (রঃ)-এর সেই কালামে এলাহীর স্বাদ এখনও স্মরণ আছে। সোব্‌হানাল্লাহ্‌! এমন মহামানবদের সম্বন্ধেই শেখ সা'দী বলিতেছেন ঃ

السست از ازل همچناں شان بگوش - بفرياد قالوا بلى در خروش

"যাহাদের কান السست -এর আওয়াযের সহিত পরিচিত। তাঁহাদের ঠোঁটের উপর قَالُوْا بَلٰے -এর ফরিয়াদ রহিয়াছে, তাঁহাদের অন্তরে সেই আওয়াযই গুঞ্জন করিতেছে।"

শিশুদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞ আলেম নিযুক্ত থাকা উচিত ঃ কানপুরের এক ছাত্র ضَرْبٌ শব্দের অর্থ 'দৃষ্টান্ত দেওয়া' অস্বীকার করিয়া বসিল। আমি তাহাকে বলিলাম ঃ তুমি তো ضَرْبٌ শব্দের এই অর্থ পড়িয়াছ। সে বলিল ঃ কোন্‌ কিতাবে? আমি বলিলাম ঃ মুনশাএ'বে। ইহাতে সে খুব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল ঃ "মুনশাএ'বে এই অর্থ কখনও উল্লেখ নাই।" আমি উক্ত কিতাব আনাইয়া তাহাকে বলিলাম ঃ ইহাতে ضَرْبٌ -এর অর্থ যাহা লিখিত আছে পাঠ কর। সে পড়িল اَلضَّرْبُ 'প্রহার করা', 'যমীনের উপর চলা' এবং 'বর্ণনা করা'—বলিয়াই থামিয়া গেল। আমি বলিলাম ঃ পূর্ণ না করিয়া থামিলে কেন? সম্মুখের দিকে পড়। তখন সে সামনের দিকে পড়িতে আরম্ভ করিল, مثل تصريفه আমি বলিলাম ঃ مثل تصريفه কেমন করিয়া বলিলে? সে বলিল ঃ "অমুক মৌলবী ছাহেব এরূপই তো পড়াইয়াছিলেন।" আমি বলিলাম ঃ খোদার বান্দা! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, সব জায়গাই শুধু تصريفه এখানে مثل تصريفه কেন হইবে? তোমার مثل (দৃষ্টান্ত) শব্দটি বর্ণনা করার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ضَرْبٌ -এর তৃতীয় অর্থ হইবে, 'দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা।' সে বলিল ঃ "হাঁ, এখন তো মনে হইতেছে—বড় ভুলের মধ্যে ছিলাম।" এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম, শিশুদের তা'লীমের জন্য উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ আলেম নিয়োগ করা উচিত। অন্যথায় অনেক কথা ভুল শিক্ষা দেওয়া হইবে। বস্তুত বাল্যকালে ভুল মনের মধ্যে বসিয়া যায়।

যাহাহউক, যাহা বিরল তাহা না থাকারই শামিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্টরূপে স্মরণ থাকে না। কেহই একথা বলে না যে, স্মরণ থাকার জন্য সমস্ত বিশেষ ও নির্দিষ্ট বিষয়সহ স্মরণ থাকা আবশ্যক; বরং বিষয়টি মোটামুটিভাবে স্মরণ থাকাই যথেষ্ট মনে করা হয়।

বাধ্যতামূলক বিশ্বাস ধর্তব্য নহেঃ সুতরাং এইরূপে اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতির বিষয়টিও সকলেরই স্মরণ আছে, নাস্তিক যদিও মুখে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে সেও তাহা স্বীকার করে। যেমন, কোন কোন নাস্তিক পরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

এক নাস্তিক বলিয়াছেঃ "আমি আমার অন্তর হইতে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব লোপ করিবার অভ্যাস আরম্ভ করিলাম। কিছু দিনের অভ্যাসে আমি যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব অন্তর হইতে লোপ করিতে সমর্থ হইলাম! ইহা শুধু অভ্যাসের কাজ, ইহাতে পারদর্শিতার কিছু নাই। কিছু দিন পরে আমার অনুভূতি জাগিল, সব কিছুকেই তো অন্তর হইতে লোপ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এবার নিজের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারি কিনা অভ্যাস করিয়া দেখা যাক। কিছু দিনের অভ্যাসে তাহাও করিতে সক্ষম হইলাম। আবার মনে জাগিল, এখন শুধু একটি বস্তু বাকী রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লোপ করা, দীর্ঘকালব্যাপিয়া সেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না। অবশেষে প্রত্যেক সৃষ্টিই যে মহাশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্ট, তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। অতঃপর তাঁহার একত্ব অন্তর হইতে লোপ করিতে অভ্যাস ও চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতেও কৃতকার্য হইলাম না। অবশেষে আল্লাহ্‌র একত্বও মানিয়া লইতে হইল। অতএব, দেখুন, اَلَسْتُ -এর প্রতিশ্রুতির বিষয়টি এমনভাবে স্মরণ আছে যে, মানুষ অন্তর হইতে নিজের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁহার একত্বের বিশ্বাসকে মন হইতে লোপ করিতে পারে না। ইহার অধিক স্মরণ আর কি হইতে পারে?

কিন্তু এই বিশ্বাস বাধ্যতামূলক কার্য, ঈমানের জন্য ইহা যথেষ্ট নহে। ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসের নাম ঈমান। অর্থাৎ, ইচ্ছা করিয়া অন্তরকে সে দিকে ঝুঁকাইয়া দিলেই তাহা ঈমান বলিয়া গণ্য হইবে। মক্কার কাফের এবং কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বাধ্যতামূলক জ্ঞানই বিদ্যমান ছিল। ইহাই اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ এবং يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ আয়াতদ্বয়ে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস ছিল না বলিয়াই তাহাদিগকে কাফের বলা হইয়াছে এবং এই কারণেই আমি বলিয়াছিলামঃ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ -এর মর্ম এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী মু'জেযা হওয়া এবং মু'জেযা নবুওয়তের আলামত হওয়ার কথা কাফেরেরা জানে না, কিংবা জানিলেও তদনুযায়ী আমল করে না। অথচ এল্‌ম ও আমলের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। যদিও তাহা কেবলমাত্র অবশ্য করণীয় বলিয়া বিশ্বাসের পর্যায়েই হউক। সুতরাং, এই পর্যায়ের বিশ্বাসকেও ইচ্ছাকৃত বিশ্বাস বলা যায় এবং ঈমানের জন্য এতটুকুই শর্ত।

সারকথা এই যে, এই শেষোক্ত বাক্যের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কারণ বর্ণনা করিতেছেন যে, নবুওয়তের ভূরিভূরি প্রমাণ এবং মু'জেযা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফেরেরা হুযূর (দঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি কেন বিশ্বাস স্থাপন করে না?

মু'জেযার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তাঃ বন্ধুগণ! এখানে আরও একটি কথা বুঝিয়া লউন, মু'জেযার প্রয়োজনীয়তা কেবল সাধারণ লোকেব জন্য। জ্ঞানবান লোকের জন্য সমষ্টিগতভাবে হুযূর (দঃ)-এর যাবতীয় অবস্থা এবং মহান ব্যক্তিত্বই এক অনুপম মু'জেযা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেনঃ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهٗ عَرَفْتُ اَنَّهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ

"আমি তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি নিরীক্ষণ করা মাত্রই বুঝিতে পারিলাম যে, এই চেহারা মিথ্যাবাদী নহে।" নবীর চেহারা অসাধারণ কেন হইবে না ? যখন ওলীগণের চেহারার অবস্থা এইরূপ ঃ

مرد حقانی کی پیشانی کا نور ـ کب چھپا رهتاهے پیش ذی شعور

"জ্ঞানী লোকের দৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহ্ওয়ালা লোকের ললাটদেশের জ্যোতি গোপন থাকিতে পারে না।"

نور حق ظاهر بود اندر ولی ـ نیك بیں باشی اگر صاحب دلی

"আল্লাহ্ওয়ালা লোকের জন্য আল্লাহ্র নূর প্রকাশ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি তুমি সত্যদর্শী অন্তরের অধিকারী হও।" আর এই নূর দেখিয়াই উপলব্ধি করা যায়, বর্ণনায় আসে না। এক আল্লাহ্ওয়ালা বলেন ঃ

گر مصور صورت آں دلستاں خواهد کشید ـ لیك حیرانم که نازش را چناں خواهد کشید

"যদি চিত্রকর সেই চিত্তবিনোদী মাহ্বুবের চিত্র অঙ্কন করিতে চায়, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না—তাহার ভাব-ভঙ্গির চিত্র কিরূপে আঁকিবে।"

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমের "মু'জেযা নবুওয়তের প্রমাণ নহে" কথার অর্থ ইহাই। কেননা, জ্ঞানবান ও বোধমান লোকের পক্ষে মু'জেযাই নবুওয়তের একমাত্র প্রমাণ নহে। হুযূরের আখলাক এবং কার্যকলাপও তাঁহার নবুওয়তের প্রমাণ। তবে সর্বসাধারণ লোকের জন্য মু'জেযাই জরুরী, বস্তুত কাফেরেরা সাধারণ লোকই বটে। দুনিয়াতে জ্ঞানবান লোকের সংখ্যা কম এবং সাধারণ লোকের সংখ্যা বেশী। এই জন্যই নবীর জন্য মু'জেযার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সাধারণ লোকের জন্যই যখন মু'জেযা নবীর নবুওয়তের প্রমাণ, তবে জ্ঞানবান লোকের জন্য কেন হইবে না ? তাহাদের জন্য তো আরও উত্তমরূপে নবুওয়তের প্রমাণ হইবে।

মহান ভবিষ্যদ্বাণীর তফ্সীল ঃ এখন আমি সংক্ষেপে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধীয় ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। ইতিহাস গ্রন্থে তাহা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। হিজরতের পূর্বে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে একবার পারসিক ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। পারসিকরা জয়লাভ করিল। ইহাতে মক্কার কাফেরেরা সন্তুষ্ট হইয়া মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল ঃ "তোমরা কিতাবধারী হওয়ার দাবী করিতেছ। পারসিকরা তোমাদের মতে মুশ্রিক। আমরাও মুশ্রিক। কিতাবধারী রোমানদের উপর পারসিকদের জয়লাভ আমাদের পক্ষে শুভলক্ষণ বটে! অর্থাৎ, আমরাও অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর জয়লাভ করিব, ইহা তাহারই পূর্বাভাস।"

কাফেরদের মুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, আগামী নয় বৎসরের মধ্যেই রোমানগণ পারসিকদের উপর জয়লাভ করিবে। ইহা অতিবড় ভবিষ্যদ্বাণী, সাধারণ কথা নহে। কেননা, দুইটি বিশাল রাজ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক। আবার ভবিষ্যদ্বাণীটিও বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত এবং সাধারণ জ্ঞানের বাহিরে। কেননা, পারস্য-রাজ্যের তুলনায় রোম-রাজ্য ক্ষুদ্রও বটে এবং নব-প্রতিষ্ঠিতও বটে। পারস্যের এই বিশাল সাম্রাজ্য আবহমানকাল হইতে একই বংশ কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ (আল্লাহ্ জানেন ইহার সত্যতা কতটুকু।) হযরত আদম আলাইহিস্সালামের পৌত্র কিংবা প্রপৌত্র কাইয়ুমরস এই

সাম্রাজ্যের প্রথম বাদশাহ্ ছিলেন। তখন হইতে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব একই বংশের হাতে রহিয়াছে। কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সুতরাং, ইহার ধনভাণ্ডার অফুরন্ত। সহস্র সহস্র বৎসরের রাজত্বের ফলে ইহার ধনভাণ্ডার যে অফুরন্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার সেনাবাহিনী ছিল খুব সুদৃঢ় ও সুশিক্ষিত। তাহাতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত বীর যোদ্ধাগণ বিদ্যমান ছিল। আবার রাজ্যের পরিধি সুপ্রশস্ত ছিল বলিয়া ইহার প্রজাসংখ্যা ছিল অগণিত। কাজেই সৈন্যসংখ্যাও অধিক হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, এরূপ একটি বিরাট শক্তিশালী রাজ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যে, তাহা একটি নব-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র রাজ্যের নিকট পরাজয় বরণ করিবে, অতি বড় ভবিষ্যদ্বাণী বটে।

আবার কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট, কোন গোলমেলে ভবিষ্যদ্বাণী নহে। যেমন আজ-কাল জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। প্রথমত, তাহারা সচরাচর সংঘটিত হয়—এমন ঘটনা সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। যেমন বলেঃ "এই ব্যক্তি পথে কোথাও কিছু খাইয়াছে।" বলাবাহুল্য, ইহা হইতে কোন্ মানুষ মুক্ত আছে? সকলেই পথে কিছু না কিছু খাইয়াই থাকে। আর কিছু না হইলেও অন্তত পান খায়। অথবা বলেঃ "এই ব্যক্তি জঙ্গলে কোন স্থানে প্রস্রাব করিয়াছে।" সফরে এরূপ প্রায়ই ঘটে। আবার তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনও নির্দিষ্টরূপে না হইয়া গোলমেলে ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে।

কোন জ্যোতিষীকে যদি কেহ প্রশ্ন করে, "আমার স্ত্রী গর্ভবতী। বল তো ছেলে জন্মিবে না মেয়ে?" তখন সে মুখে কোন উত্তর না দিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দেয়, "ছেলে না মেয়ে।" যদি ছেলে সন্তান হয়, তখন সে বলেঃ আমি বলি নাই যে, "ছেলে হইবে, মেয়ে নহে।" আর মেয়ে সন্তান জন্মিলে বলে, আমি তো প্রথমেই বলিয়াছিলাম ছেলে নহে—মেয়ে জন্মিবে। আর গর্ভপাত হইয়া গেলে বলেঃ আমি তো ইহাই বলিয়াছিলাম যে, ছেলেও নহে মেয়েও নহে। লিখনে তো স্বর নাই। অতএব, সে ঘটনা ঘটিবার পরে লিখিত বাক্যের অনুকূলে স্বর প্রয়োগে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া দেয়। স্বর এবং উচ্চারণ অর্থ বা ভাব প্রকাশে খুব সাহায্য করিয়া থাকে। এই কারণেই হানাফী মতে ছাহাবীর আমল তাঁহার রেওয়ায়তের বিপরীত হইলে সেই রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা, আমরা হুযূরের স্বর এবং লক্ষণাদি শুনিও নাই, দেখিও নাই। ছাহাবাগণ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন। অতএব, সম্ভবত হাদীসের শব্দ হইতে আমরা যে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহা ঠিক নহে। ইহা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বলিয়া ফেলিলাম।

আমি বলিতেছিলাম, কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় গোলমেলে এবং অস্পষ্ট নহে। এতদ্ভিন্ন কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সীমা নির্দেশ করেন নাই। سَيَغْلِبُوْنَ শব্দে س যোগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—তাহা অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে। আবার فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ "ন্যূনাধিক নয় বৎসরের মধ্যে" বলিয়া ইহার সময় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নয় বৎসরের মধ্যেই রোমানগণ পারসিকদিগকে পরাজিত করিবে।

ইহা পাগলের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় নহে। এক পাগল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলঃ "অমুক স্ত্রীলোকের সহিত আমার বিবাহ হইবে। ঘটনাক্রমে তাহার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেল।" সে পুনরায় দাবী করিল, "সে বিধবা হইবে এবং আমার সহিত বিবাহিতা হইবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও হইল না। পাগলটি আক্ষেপ লইয়াই কবরে চলিয়া গেল। তখন তাহার অনুগামীরা এরূপ অর্থ করিল যে, উক্ত স্ত্রীলোকের সন্তানদের মধ্যে কেহ এই ভবিষ্যদ্বক্তার কোন সন্তানের বিবাহ অধীনে

আসিবে। সোব্হানাল্লাহ্! এমন উদ্ভট অর্থ গ্রহণেও যদি ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তবে প্রত্যেকের ভবিশ্যদ্বাণীই সত্য হইয়া যাইবে। কাহারও কোন কথাই মিথ্যা হইবে না।

কাজেই বলি, কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এরূপ নহে; বরং পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে রোমানদের বিজয়ী এবং পারসিকদের পরাজিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই জন্য করিয়াছেন যে, মক্কার কাফেরেরা পারসিকদের জয়ে এই শুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিল যে, আমরাও এইরূপে মুসলমানদের উপর জয় লাভ করিব। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রমাণের অন্তর্গত বাক্যগুলির উপর কোন মন্তব্য করেন নাই যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করার দ্বারা তাহার সদৃশ সম্প্রদায়ের বিজয় অপর সদৃশ সম্প্রদায়ের উপর জয় লাভ করা অবধারিত নহে; বরং এরূপ বলিয়া দিয়াছেন যে, শীঘ্রই ইহার বিপরীত ঘটিবে। রোমানরা পারসিকদের উপর জয় লাভ করিবে। তখন তোমাদের ইহার বিপরীত লক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। সোব্হানাল্লাহ্! কেমন বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গি । ইহা তাহাদের জন্য দাঁতভাঙ্গা উত্তর।

অতঃপর মুসলমানদিগকে আর একটি প্রকৃত ও যথার্থ আনন্দ সংবাদ শুনাইতেছেন। রোমানদের জয়লাভে তোমরা তো এই জন্য আনন্দিত হইবে যে, তাহাতে কাফেরদের শুভ লক্ষণ বিবেচনা প্রকাশ্যভাবে নিরর্থক প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং এতদসঙ্গে সেই মুহূর্তেই তোমরা যথার্থ আনন্দও লাভ করিবে ঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ .

"সেদিন মক্কার কাফেরদের উপর জয় লাভ করিয়া যথার্থ আনন্দও লাভ করিবে।" পক্ষান্তরে কাফেরেরা এখন শুধু কাল্পনিক আনন্দ ভোগ করিতেছে। আর ভবিষ্যতে তাহারা যথার্থ অপমানিত ও অপদস্থ হইবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার এখানে এক সঙ্গে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। (১) পারসিকদের উপর রোমানদের জয়লাভের। (২) এবং কাফেরদের উপর মুসলমানদের জয়লাভের। ইহা কাফেরদের মন্তব্যেরই উত্তর ছিল।

হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাপদ্ধতি ঃ কোরআন মজীদ যেহেতু রূহানী চিকিৎসা, সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; বরং ইহার পরে বলিতেছেন ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী সংঘটিত হওয়ার ফলে কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু তবুও তাহারা অবিশ্বাসীই থাকিয়া যাইবে। ইহার কারণ জানিয়া লওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল লক্ষণেরই চিকিৎসা করেন না; মূল রোগেরও চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই রূহানী চিকিৎসার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করি না। পক্ষান্তরে দৈহিক চিকিৎসার প্রতি তো আমরা এত গুরুত্ব প্রদান করি যে, স্বভাবের সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটিলে চিকিৎসক খুঁজিতে আরম্ভ করি। কিন্তু রূহানী চিকিৎসা সম্বন্ধে এত অমনোযোগী যে, তৎপ্রতি লক্ষ্যই করি না। এ সম্বন্ধে মাওলানা রূমী বলিতেছেন ঃ

چند خوانی حکمت یونانیاں   حکمت ایمانیاں را هم بخواں
صحت ایں حس بجوئید از طبیب   صحت آں حس بجوئید از حبیب

"ইউনানী চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়িয়াছ। ঈমানদারগণের চিকিৎসা বিজ্ঞানও পড়। দৈহিক সুস্থতা চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী, আর রূহানী সুস্থতা সেই প্রিয় হাবীবের (খোদার রাসূলের) মুখাপেক্ষী।"

তিনি দৈহিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞ যিনি মূল রোগের চিকিৎসা করেন। আর যিনি লক্ষণের চিকিৎসা করেন তিনি অনভিজ্ঞ। কেহ কাশির অভিযোগ করিলে ‘মুলঠি’ এবং জ্বরের অভিযোগ করিলে ‘গুলে-গাওজবান’ ব্যবস্থা করিয়া দেন। কাশি ও জ্বরের মূল কারণ কি, চিন্তা করিয়া দেখেন না। আসলে সেই মূল কারণেরই চিকিৎসা হওয়া উচিত।

এই শ্রেণীরই এক চিকিৎসক আমাদের মহল্লার নিকটে বাস করেন। তিনি এলমে তিব্বের দুই-তিনখানি উর্দু কিতাব পড়িয়াই চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন! মজার ব্যাপার এই যে, তিনি রোগীদিগকে বলিয়াছেনঃ “অপর কোন হাকীম দ্বারা রোগ নির্ণয় করাইয়া আস। ঔষধ আমি ব্যবস্থা করিব।” কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারিত—আপনি রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে চিকিৎসা করিবেন কিরূপে? রোগ নির্ণয়ের পর রোগীর স্বভাব নির্ণয়েরও প্রয়োজন রহিয়াছে। চিকিৎসা গ্রন্থের ব্যবস্থাপত্র সকল রোগীর স্বভাবের অনুকূল হয় না, যদিও কোন বিশেষ অবস্থায় রোগের অনুকূল হয় বটে। রোগ নির্ণয়ের পর অভিজ্ঞ চিকিৎসকও চিকিৎসা পুস্তক হইতেই ব্যবস্থাপত্র দিবেন এবং তৎসঙ্গে তিনি রোগীর স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুস্তকের ব্যবস্থায় কিছু রদবদল অবশ্যই করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আদৌ রোগ নির্ণয় করিতে পারে না, সে এসমস্ত বিষয়ের প্রতি কেমন করিয়া লক্ষ্য রাখিবে? তবে এতদসত্ত্বেও সর্বসাধারণ তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবার কারণ এই যে, রোগ নির্ণয় ক্ষণেকের ব্যাপার। একবার শিরা দর্শনেই হইয়া যায়। আর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বার বার ডাকাইলে ভিজিট-ফি এবং যাতায়াত খরচ অনেক লাগিয়া যায়। সুতরাং, অভিজ্ঞ চিকিৎসককে একদিনের জন্য ডাকাইয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লয় এবং সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে থাকে।

তরজমা পাঠ করিয়া চিকিৎসক হওয়া সম্বন্ধে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কানপুরের নেযামী লাইব্রেরীতে একখানা পত্র আসিল, পত্রখানার বানানও শুদ্ধ ছিল না। ইহাতে লিখিত ছিল, “আমি একজন মুফ্‌তী, আমার নিকট শ্বরহে বাকিয়্যাহ্ (শরহে বেকায়াহ্) কিতাবের উর্দু তরজমা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি মাস্‌আলার জবাব দিয়া থাকি, ফতওয়াও লিখি, ওয়াযও করি। আমার নিকট ওয়াযের কিতাবও আছে। এখন জনসাধারণ অনুরোধ করিতেছে—“আপনার দ্বারা সর্বপ্রকারের ফয়েয ও উপকার হইতেছে। কিন্তু ‘তিব্ব’ সম্বন্ধে আপনি কোনই ফয়েয দিতেছেন না। ইহাও আরম্ভ করুন।” অতএব, যদি আপনার লাইব্রেরীতে ‘তিব্বে এহ্‌সানী’ নামক উর্দু কিতাব থাকে, তবে আমার নামে ইহার এক কপি প্রেরণ করুন। যেন এই ফয়েযটিও আমি জারি করিয়া দিতে পারি।”

তরজমা পাঠকারীদের আরও একটি গল্প বলিতেছি—জনৈক গায়রে মুকাল্লেদ্ (মাযহাবে আস্থাহীন) ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করিলে হেলিয়া-দুলিয়া নামায পড়াইতেন। একাকী নামায পড়িলে একটুও নড়িতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেনঃ হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ اَمَّ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ ইহার তরজমা লিখিত ছিল, “ইমাম হইলে هلكے (হাল্‌কে) অর্থাৎ, সংক্ষেপে নামায পড়িবে।” কিন্তু সেই ব্যক্তি শব্দটিকে هلكے (হেল্‌কে) অর্থাৎ, ‘নড়িয়া-চড়িয়া’ অর্থ করিয়াছেন। কাজেই তিনি ইমাম হইলে খুব ‘হেলিয়া-দুলিয়া’ নামায পড়াইতেন। এমন মূর্খতা হইতে খোদা রক্ষা করুন।

আর এক দুনিয়াদার মৌলবীর ফতওয়া আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, সে এক ব্যক্তিকে ফতওয়া লিখিয়া দিয়াছে, “শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয।” দলিল পেশ করিয়াছেনঃ “বিবাহিতা স্ত্রীর

মাতাকে শাশুড়ী বলে ; যাহাকে জায়েয ও শুদ্ধরূপে বিবাহ করা হয়, সে-ই বিবাহিতা স্ত্রী হয়। এই ব্যক্তির স্ত্রী মূর্খ, অনেক সময় কুফরী কালাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। বিবাহের সময় তাহার ঈমান নূতন করিয়া লওয়া হয় নাই। অতএব, তাহার সহিত বিবাহ শুদ্ধ হয় নাই, কাজেই তাহার মাতাও শাশুড়ী নহে।” হতভাগা শুধু ধারণা-অনুমানের উপর বিবাহই নষ্ট করিয়া দিল। “সহবাসকৃতা স্ত্রীর মাতা হারাম হওয়ার” মাসআলাটিকে এই বলিয়া উড়াইয়া দিল যে, ইহা শুধু আবু হানীফার মত, আমি তাহা মানি না।

এই ঘটনাগুলি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া ফেলিয়াছি। আমার মূল বক্তব্য ছিল—সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসক লক্ষণের চিকিৎসা করে, কারণের চিকিৎসা করে না।

ইহাদের দৃষ্টান্ত ঠিক সেইরূপ—যেমন কোন গ্রামে এক ব্যক্তি অতি উচ্চ এক তাল গাছে চড়িয়া বসিল। এখন নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া নামিতে ভয় হইতে লাগিল। সম্ভবত সে শুধু উঠিতেই জানে, নামিতে জানে না। তরীকতের পথেও এমন কতক লোক আছেন—যাঁহারা উন্নতি করিয়া যাইতেছেন বটে ; কিন্তু নিম্নগামী হন না। যেমন, ‘মাজ্‌যূব’ অর্থাৎ, আত্মহারা লোক ; ইঁহারা কামেল নহেন ; কামেল তাঁহারাই যাঁহারা ঊর্ধ্বগামীও হইতে পারেন, নিম্নগামীও হইতে পারেন। যাহাহউক, লোকটি গাছের উপর হইতে চীৎকার করিতে লাগিল ঃ “কোনরূপে আমাকে নামাও।” সমস্ত মানুষ অস্থির হইয়া পড়িল, কিরূপে নামাইবে। অবশেষে “বুদ্ধির ঢেঁকি”কে ডাকিয়া আনিল। গ্রামের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত ছিল। প্রথমত সে একবার গাছের আগাগোড়া দেখিয়া লইল এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল ঃ বস্, বুঝিতে পারিয়াছি। একটা লম্বা রশি আন এবং তাহার কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া তাহার কোমরের সহিত বাঁধিতে বল। কথামত কাজ করা হইল। অতঃপর সে বলিলঃ রশি ধরিয়া তোমরা জোরে হেঁচ্‌কা টান দাও। যেমন কথা তেমন কাজ। বেচারার দেহ তো টানের চোটে নীচে চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার প্রাণপাখী উপরের দিকে উড়িয়া গেল। লোকে বুদ্ধির ঢেঁকিকে বলিল ঃ ব্যাপার কেমন হইল ? সে বলিল ঃ “তাহার অদৃষ্ট, আমি তো এই উপায়ে অনেক মানষুকে কূপ হইতে বাহির করিয়াছি।” সেই সস্তা মূল্যের হাতুড়ে চিকিৎসকদের অবস্থাও এইরূপ। কেবল বাহ্যিক চিকিৎসা করিয়া থাকে। কারণের প্রতি লক্ষ্য করে না। যেমন, সেই বোকা একটিমাত্র উপায় মনে রাখিয়া উহাকে কূপেও ব্যবহার করিয়াছে—গাছেও ব্যবহার করিয়াছে।

এক হাতুড়ে বৈদ্য আমাকে হার্নিয়া রোগের ঔষধ দিল, তাহা কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। আমি হাতুড়ে বৈদ্যের চিকিৎসা কখনও গ্রহণ করি না, কিন্তু তখন ধারণা করিলাম, বাহ্য প্রয়োগের ঔষধে ক্ষতি কি ? جوں قضا آید طبیب ابله شود “মৃত্যু যখন আসে, তখন চিকিৎসকও বুদ্ধিহীন হইয়া যায়।” আমি উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলাম, ফলে আমার সমস্ত দেহে শৈত্য এত প্রবল হইয়া পড়িল যে, আমার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপও অনেক কমিয়া গেল। অবশেষে আমি ইহা ত্যাগ করিয়া হাকীমের আশ্রয় নিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ঔষধ সেবনে আমার শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ নিজের অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

কামেল পীরের পরিচয় ঃ দৈহিক চিকিৎসাক্ষেত্রে যেমন কতক হাতুড়ে চিকিৎসক রহিয়াছে, তদ্রূপ তরীকতের পথেও কোন কোন পীর অশিক্ষিত এবং হাতুড়ে হইয়া থাকেন। এই কারণে আমি পীরে কামেলের পরিচয় বলিয়া দিতেছি। তন্মধ্যে এক পরিচয় পীরের সহিত সংস্রবের পূর্ববর্তী, আর এক পরিচয় পরবর্তী। সংস্রবের পূর্বে যাচাই করিয়া দেখা উচিত, যুগের অন্যান্য

কামেল লোকগণ তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। যদি তাঁহারা কামেল বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে কামেলই মনে করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, সংশ্রবের পর লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখনই তাঁহার হাতে বাইআত করার জন্য তাড়াহুড়া করিবে না; বরং তাঁহার নিকট নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া কার্য আরম্ভ কর। যদি তিনি বাইআত ভিন্ন কাজের নির্দেশ না দেন, তবে তাঁহাকে অপূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত মনে করিবে। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পীরের অনুসন্ধান করিতে থাক। অন্য পীরের দরবারেও প্রথমে কাজ আরম্ভ কর এবং নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করিতে থাক। লক্ষ্য করিতে থাক—তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে মনে শান্তি ও তৃপ্তি হয় কিনা? শান্তি হইলে মনে করিবে, তিনি কামেল এবং মন্‌যিলে মক্‌ছুদ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। আর শান্তি না হইলে মনে করিবে, ইনিও অপূর্ণ এবং অনভিজ্ঞ। সালেক বা খোদাপন্থীদের প্রকৃত অবস্থা বুঝেন না। এই মর্মেই মাওলানা বলিয়াছেন ঃ

وعدها باشد حقيقى دلپذير ـ وعدها باشد مجازى تاسه گير

"প্রকৃত ওয়াদা শান্তিদায়ক এবং অপ্রকৃত ওয়াদা অস্থিরকারক হইয়া থাকে।"

تاسه گير শব্দের অর্থ অস্থিরতা, অপ্রকৃত ওয়াদায় অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে সত্য ওয়াদা পাইলে মনে শান্তি আসে। হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে ঃ

اَلصِّدْقُ طَمَانِيْنَةٌ وَّالْكِذْبُ رِيْبَةٌ

"সত্যে শান্তি এবং অসত্যে অস্থিরতা।"

وعدهٔ اهل كرم گنج رواں ـ وعدهٔ نا اهل چوں رنج رواں

"দাতা ব্যক্তির ওয়াদা ধন দান, আর অমানুষের ওয়াদা কষ্টদায়ক হইয়া থাকে।" ইহার দ্বারা আরেফ শীরাযী এই শ্রেণীর অশিক্ষিত পীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিম্নের কবিতায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই শ্রেণীর পীরের তত্ত্বজ্ঞানহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার একটি প্রমাণ বটে।

خستگاں را كه طلب باشد وقوت نه بود ـ گر تو بيداد كنى شرط مروت نه بود

"যে সমস্ত দুরবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে কামনা আছে, কিন্তু শক্তি নাই, যদি তুমি তাহাদের প্রতি বে-ইন্‌সাফী কর, তবে তাহা মনুষ্যত্ব বিরোধী হইবে।" কোন পীর প্রত্যেক মুরীদকে বলিয়া দেয়, আমার নিকটে ছয় মাস থাক। পরিবার-পরিজনবিশিষ্ট লোক হইলে তাহাকেও ছয় মাস থাকার জন্য বলা হয়। সে বলে ঃ "এতদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" তখন পীর ছাহেব বলেন ঃ "তবে আমার নিকট আসিয়াছ কেন?" ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, এই পীর তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। কোন চিকিৎসক গরীব রোগীকে পঞ্চাশ টাকার ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। রোগী অপারকতা প্রকাশ করিলে যদি চিকিৎসক বলেন যে, "তবে আমার নিকট আসিয়াছ কেন?" এমতাবস্থায় বুঝিতে হইবে, এই চিকিৎসক অভিজ্ঞ নহেন। তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী চিকিৎসক, যিনি নামমাত্র মূল্যে গরীব লোকের চিকিৎসা করিয়া দেন।

আমাদের পীর ছাহেব (রঃ) জনৈক ধনী লোককে কোন রোগের চিকিৎসায় জামের কচি পাতা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। আর এক ধনীকে 'ওগাছ বেলের' পাতা দুধে সিদ্ধ করিয়া পান করিতে বলিয়াছিলেন। আর এক ব্যক্তিকে সেমাই বলক দিয়া খাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার

ব্যবস্থাপত্রে সর্বদা দুই-এক পয়সা মূল্যের ঔষধ থাকিত। কোন কোন সময় বিনামূল্যের বনজ ঔষধ বলিয়া দিতেন। দেওবন্দের চিকিৎসকগণ বলিতেনঃ ইহা চিকিৎসা নহে, মাওলানার কারামত। এমন সাধারণ ঔষধে ফল হইয়া যায়। মাওলানা তাহা শুনিয়া হাসিতেন এবং বলিতেনঃ 'ইহারা তিব্ব শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু জানেই না।'

অতএব, তত্ত্বজ্ঞানী লোকের সন্ধান কর। তত্ত্বজ্ঞানী লোক পাইলে তাঁহার আনুগত্য কর এবং তাঁহার সম্মুখে নিজের মতামতকে বিলুপ্ত করিয়া দাও। পূর্বে মুরীদদের আনুগত্যের এমন অবস্থা ছিল যে, যদি পীর ছাহেব কোন মুরীদকে বলিতেনঃ "তুমি অপর কাহারও নিকট হইতে তা'লীম হাসিল কর।" মুরীদ তৎক্ষণাৎ তাহাতে রাজী হইয়া যাইত এবং পীরের কথা মান্য করিলে তাহার উপকার হইবে মনে করিত। মনে করিত, আমি তাঁহার নির্দেশে যাঁহার কাছেই যাই না কেন—তাঁহারই ফয়েয লাভ করিতে থাকিব।

এক ব্যক্তি হযরত মাওলানা গঙ্গোহী রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিকট বাইআতের আবেদন জানাইল। তিনি বলিলেনঃ "তুমি মাওলানা কাসেম ছাহেবের নিকট বাইআত হও, তিনি বেশী কামেল।" সে মাওলানা কাসেম ছাহেবের দরবারে গেল। তিনি বলিলেনঃ তুমি মাওলানা গঙ্গোহী ছাহেবের নিকট যাইয়া বাইআত হও, তিনি অধিক কামেল। সে পুনরায় হযরত গঙ্গোহীর দরবারে গেল, তিনি আবার মাওলানা কাসেম ছাহেবের দরবারে পাঠাইলেন, এইরূপে কয়েকবার বেচারাকে দৌড়াইলেন। অবশেষে একদিন গঙ্গোহ্ কিংবা নানুতায় উভয় মহাপুরুষের সম্মিলন হইল। উভয়ে মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন, সেই লোকটি রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিলঃ "এখন তোমরা একত্রিত হইয়াছ, আমার সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া লও এবং যেকোন একজন আমাকে বাইআত কর। এবিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি পথ ছাড়িব না।" তখন উভয়ের মধ্যে কোন একজন তাহাকে বাইআত করিয়া লইলেন।

কিন্তু আজ-কালের অবস্থা এই যে, কাহাকেও অন্য কোন পীরের নিকট তা'লীম হাসিল করিতে পরামর্শ দিলে সে তাহা মানে না; বরং মনে করে যে, আমার সহিত টালবাহানা করা হইতেছে এবং ভুল পরামর্শ দিতেছে। আনুগত্যের এরূপ অবস্থা হইলে ফল কিরূপে লাভ করিবে? প্রসঙ্গক্রমে মধ্যস্থলে এই আলোচনা আসিয়া গিয়াছিল। আমি বলিতেছিলামঃ "তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই, যিনি মূল কারণের চিকিৎসা করেন।" শুধু লক্ষণের চিকিৎসা করেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর ও কামেলের চিহ্ন ইহাই বটে।

সংসারানুরাগ ও পরকালের প্রতি উদাসীনতাঃ আল্লাহ্‌র কালামের এত মহিমা—উহাতে রোগ নির্ণয়ও থাকে, রোগের কারণসমূহের উল্লেখও থাকে এবং কারণের চিকিৎসাব্যবস্থাও দেওয়া হয়। এখানে কোন রোগীকে নৈরাশ্যজনক উত্তর দেওয়া হয় না। আফসোস! এমন পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয়! আর ইহার এত অমর্যাদা! আমরা ইহা পড়াশুনার প্রতি একটুও গুরুত্ব প্রদান করি না। ভূমিকা অনেক দীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, এই রোগের কারণ বড় কঠিন ও গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে কাফেরদের অস্বীকৃতি ও বিমুখতার কারণ বর্ণনা করিতেছেন যে, ইহারা নবুওয়তের এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকা এবং এত মু'জেযা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনয়ন করে না। ইহার কারণ এই যে, ইহারা কেবল দুনিয়াকেই চিনে। অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতি তাহাদের বিশেষ পর্যায়ের মনোযোগ রহিয়াছে। আর তাহারা আখেরাতকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া

রহিয়াছে। কারণের সারমর্ম দুইটি বিষয়। (১) দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ। (২) আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। এখন নিজের অন্তরে যাচাই করিয়া দেখুন, কেহ কি ইহাকে রোগ মনে করেন ? চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে, কেহই উহাকে রোগ মনে করেন না। কেহ কেহ মনে করিলেও অতি সাধারণ রোগ মনে করিয়া থাকেন। বস্তুত যে রোগকে সাধারণ মনে করা হয়, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। যদিও হালীর কবিতা পড়িতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি এই কবিতাগুলিতে যথার্থ বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

کسی نے يه بقراط سے جاکے پوچھا مرض تيرے نزديك مهلك هے كيا كيا
کها دكهه نهيں كوئى دنيا ميں ايسا كه جس كى دوا حق نے كى نه هو پيدا
مگر وه مرض جسكو آسان سمجهيں كهے جو طبيب اسكو هذياں سمجهيں

"দার্শনিক বোক্‌রাতকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মতে মারাত্মক রোগ কি কি ? তিনি বলিলেন ঃ দুনিয়াতে এমন কোন রোগ নাই যাহার ঔষধ আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করেন নাই। কিন্তু ঐ রোগই মারাত্মক, মানুষ যাহাকে সহজ মনে করে এবং চিকিৎসকের পরামর্শকে প্রলাপ মনে করে।"

প্রকৃতপক্ষে কঠিন রোগের চিকিৎসাও গুরুত্বের সহিত করা হইলে তাহা সহজ হইয়া যায়। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

مَا مِنْ دَآءٍ اِلَّا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهٗ دَوَآءً

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ নাযিল করিয়াছেন।" কেবল যাহেরী রোগের জন্যই নহে ; বরং বাতেনী রোগের জন্যও বটে। অবশ্য কোন রোগকে সাধারণ মনে করিয়া এড়াইয়া গেলে এবং উহার চিকিৎসা না করা হইলে কিংবা গুরুত্বের সহিত করা না হইলে তাহা বড়ই মারাত্মক। কেননা, ইহা ভিতরে শিকড় গজাইবে। অতঃপর গুরুত্ব এবং মনোযোগ প্রদান করিলেও কোন ফল হইবে না। সংসারানুরাগ ও পরকাল বিস্মৃতি রোগের সহিতও আমাদের অনুরূপ অবস্থা চলিতেছে। আমরা ইহাকে খুবই সাধারণ মনে করিতেছি। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, দুনিয়ার মোহ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগ ও অমনোযোগিতাই কাফেরদের ঈমান আনয়ন না করার মূল কারণ। অথচ আমরা ইহাকে মামুলী বা সাধারণ মনে করিতেছি।

বলাবহুল্য, যাহা মূল তাহা শাখা অপেক্ষা অধিক দৃঢ়। যদি কুফরীর মূল দুনিয়ার অনুরাগ এবং আখেরাতের প্রতি বিরাগকে সহজ মনে করা হয়, তবে কি এই নিয়ম অনুসারে (নাউযুবিল্লাহ্) কুফরীকেও সাধারণ এবং সহজ বলিতে হইবে ? কখনই না। অতএব, বুঝা গেল, সংসারানুরাগ ও পরকাল বিস্মৃতি রোগ কুফরী অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। যদিও আল্লাহ্‌র শোক্‌র, কাফেরদের মধ্যে আখেরাতের প্রতি যে পর্যায়ের অমর্যাদা ও উদাসীনতা রহিয়াছে—সেই পর্যায়ের অমনোযোগিতা আমাদের মধ্যে নাই এবং আখেরাতের প্রতি কাফেরদের উদাসীনতাই কুফরী অপেক্ষা অধিক কঠিন। কেননা, তাহারা তো আখেরাতের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, কেবল দুনিয়াকেই চিনে। পক্ষান্তরে আমরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী এবং দুনিয়া ভিন্ন আরও একটি জগৎ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। অবশ্য এতটুকু ত্রুটি আছে যে, আমলের বেলায় সেই বিশ্বাসকে সম্মুখে উপস্থিত রাখি না। তজ্জন্য আসবাব-উপকরণ সংগ্রহেরও তত আয়োজন করি না। অতএব, আমাদের মধ্যে কাফেরদের ন্যায় সর্বোচ্চস্তরের উদাসীনতা না থাকিলেও যে পর্যায়েরই আছে, তাহাকে সাধারণ বলা যায় না। কেননা, এই নিম্ন পর্যায়ের অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া কি কঠিন ?

সর্দি-কাশি প্রথমত সাধারণভাবেই দেখা যায়। কিন্তু মামুলী মনে করিয়া অবহেলা করিলে ক্রমে ক্রমে ইহাই যক্ষ্মার আকার ধারণ করে। এইরূপে তামাক ও আফিম প্রথমত অল্প মাত্রায় সেবন আরম্ভ করা হয়। অতঃপর ইহা নিজেই উন্নতি করিতে চায়। এমন কি, শুরুতে এক রতি আফিম বা তামাক সেবনকারী এক বৎসরের মধ্যে কয়েক মাষা খাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কেননা, নেশাজনক বস্তুর বিশেষত্ব এই যে, ইহার চাহিদা নিজে নিজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দুনিয়ার মধ্যেও যেহেতু এক প্রকারের মাদকতা রহিয়াছে। যেমন, প্রসিদ্ধ আছে যে, একশত টাকার মধ্যে এক বোতল মদের সমপরিমাণ মাদকতা রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং অনুরাগ দিন দিন উন্নতি করার ইহাই একমাত্র কারণ। যে ব্যক্তির মাসিক বেতন ২০ টাকা, সে বলে, মাসিক ৫০ টাকা হইলে খুব ভাল হইত। যখন ৫০ টাকা হয়, তখন ৭০ টাকা হওয়ার তালে থাকে। ৭০ টাকা হইলে ১০০ টাকার আকাঙ্ক্ষায় থাকে। এইরূপে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষাতেই মত্ত থাকে। "মুতানাব্বী" এ সম্বন্ধে কেমন সুন্দর কবিতা বলিয়াছেন ঃ

رُبَمَا احْتَسَبَ الْاِنْسَانُ غَايَتَهَا   وَفَاجَأَتْهُ بِاَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَسَبِ
وَمَا قَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهٗ   وَلَا يَنْتَهِىْ اِرَبٌ اِلَّا اِلٰى اِرَبِ

"অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, মানুষ তাহার পার্থিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করে, কিন্তু অকস্মাৎ কল্পনার অতীত কিছু ঘটিয়া যায়। কেহই দুনিয়া হইতে নিজের মতলব সিদ্ধ করিতে পারে না। এক প্রয়োজন মিটিতে না মিটিতে আর এক প্রয়োজন আসিয়া দেখা দেয়।"

অতএব, দেখুন, দুনিয়ার জন্য মানুষের এত মোহ, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এরূপ অবস্থা—প্রত্যেকেই আখেরাতের জন্য অল্পতেই তৃপ্ত হইয়া যায়। আখেরাতের কাজে একটু উন্নতি করার জন্য কাহাকেও উপদেশ দিলে সে বলে, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো পড়িতেছি। আর কি প্রাণ বাহির করিয়া নিবেন ?" অনেকে তো এরূপও আছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার শান্তি ও উন্নতি নিরাপদে থাকে, ততক্ষণই আখেরাতের প্রতি মনোযোগী থাকে। কোন কারণে দুনিয়ার কিছুমাত্র ক্ষতি হইলে আখেরাতের কার্য ত্যাগ করিয়া বসে। যেন এতদিন একমাত্র পার্থিব কার্যের পরিপাট্য রক্ষার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত করিতেছিল। এ সকল ধর্মীয় কার্য করিতে করিতে যদি ঘটনাক্রমে দুনিয়ার কাজের কোন ক্ষতি হইয়া যায়, তবে খোদার উপর রাগান্বিত হইয়া উঠে। যেমন, এক গেঁয়ো লোক রোযা রাখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিনই তাহার একটি মহিষ মারা গেল। হতভাগা তৎক্ষণাৎ লোটা মুখে লাগাইয়া পানি পান করিল এবং আসমানের দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল ঃ "আর রাখিলাম রোযা। নেও তোমার রোযা !"

এইরূপে এক বৃদ্ধের ছেলেপিলেরা বৃদ্ধকালে তাহার সেবা-শুশ্রূষা না করার কারণে সে গৃহ ছাড়িয়া মসজিদে চলিয়া গেল এবং রীতিমত নামায-রোযা করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে ছেলেদের খেত-কৃষির ক্ষতি হইয়া গেল, পালের কতক গরু-ছাগল মরিল এবং শস্য নষ্ট হইয়া গেল। ছেলেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এই বৃদ্ধের নামায-রোযার কারণেই এসমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। সকলে একত্রিত হইয়া তাহার নিকট গিয়া বলিল, "তুমি ঘরে যাইয়া বাস কর। আমরা রীতিমত তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব। কিন্তু তুমি নামায পড়িও না।" সে বলিল ঃ "আচ্ছা। কিন্তু দেখিও, ওয়াদা ভঙ্গ করিও না। অন্যথায় আমি চাটাই-বদনা লইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিব।" সকলে পাক্কা ওয়াদা করিল। বৃদ্ধ নামায ছাড়িয়া দিল এবং প্রচুর পরিমাণে ঘি-দুধ খাইতে

লাগিল। অতঃপর যখনই ছেলেরা সেবা-শুশ্রূষায় ত্রুটি করিত, তখনই বৃদ্ধ বলিতঃ "আন্ তবে আমার ওযূর বদ্‌না।" ছেলেরা তখনই ভয় পাইয়া তাহার খোশামোদ আরম্ভ করিতঃ "তুমি নামায পড়িও না। এখন হইতে সেবা-শুশ্রূষায় আর ত্রুটি হইবে না।" ফলকথা, নামাযের ভয় দেখাইয়া বৃদ্ধ ছেলেদের নিকট হইতে খুব খেদমত আদায় করিয়া লইল।

বর্নিত রূপ আহ্‌মক আজকাল মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম। কদাচিৎ কেহ এরূপ থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কেননা, যে ব্যক্তি নামায-রোযাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই নহে। কিন্তু যে মুসলমান নামায-রোযাকে বরকতের বস্তু মনে করে, তাহাদের অবস্থাও তথৈবচ। প্রত্যেকে যে অবস্থায় আছে ইহাতেই তৃপ্ত রহিয়াছে। ইহা হইতে উন্নতি করার চিন্তাও নাই, চেষ্টাও নাই। এ সম্বন্ধে মহাত্মা ইমাম গায্‌যালী (রঃ) খুব সুন্দর লিখিয়াছেনঃ

أَرَى الْمُلُوْكَ بِأَدْنَى الدِّيْنِ قَدْ قَنِعُوْا ـ وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوْا بِالْعَيْشِ بِالدُّوْنِ
فَاسْتَغْنِ بِالدِّيْنِ عَنْ دُنْيَا الْمُلُوْكِ كَمَا ـ اِسْتَغْنَى الْمُلُوْكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّيْنِ

"আমি বাদশাহ্‌দিগকে দেখিতেছি, তাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে অতি সামান্য বস্তুতেই তৃপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পার্থিব আড়ম্বরের ব্যাপারে অল্পতে সন্তুষ্ট হয় না।" পরবর্তী কবিতায় ধার্মিক লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেনঃ "তোমরাও বাদ্‌শাহ্‌দের দুনিয়া হইতে তেমনি বেপরোয়া হইয়া যাও, যেমন তাহারা দুনিয়া অবলম্বনপূর্বক ধর্ম হইতে বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে।" তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে হারাইতে পার না। অতএব, ধর্মের ব্যাপারে তাহাদিগকে হারাইয়া দাও। এই তো হইল ধর্ম বা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতার কথা।

এখন দুনিয়ার মোহে মত্ত হওয়ার কথা শুনুন। আমাদের অবস্থা এই যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ অত্যধিক। যদিও কাফেরদের ন্যায় তত লিপ্ততা নাই। তাহারা তো সর্বক্ষণ দুনিয়াতেই মগ্ন রহিয়াছে। আখেরাতের অস্তিত্বে বিশ্বাসই নাই। আমাদের মধ্যে তত লিপ্ততা না থাকিলেও এক শ্রেণীর লিপ্ততা আমাদের মধ্যেও আছে। অর্থাৎ, আখেরাতের চেয়ে দুনিয়ার কামনা আমাদের মধ্যে অধিক এবং দুনিয়ার জন্য আখেরাতের চেয়ে অধিক চেষ্টা করিয়া থাকি। আমি আফিমের দৃষ্টান্তে একটু আগে বলিয়াছি যে, সামান্য রোগও কঠিন আকার ধারণ করিয়া থাকে; বরং কোন কোন সময় সামান্য মনে করিয়া অবহেলা করা হয় বলিয়া মারাত্মক হইয়া পড়ে। বস্তুত ঘুষঘুষে জ্বর অতিশয় মারাত্মক। তাহা স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া যায়। টের করা যায় না। স্মরণ রাখিবেন, দুনিয়ার অনুরাগ কুফরীর মূল। ইহাকে কখনও সাধারণ মনে করিবেন না। একথাও স্মরণ রাখুন, মূলকে কখনও সহজ বা সাধারণ মনে করা উচিত নহে। আমি নিজে বানাইয়া বলিতেছি না; বরং বহু বুযুর্গ লোকের বাণী হইতে আমার এই উক্তির পোষকতা পাইবেন। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

علت ابلیس انا خیر بدست ـ این مرض در نفس هر مخلوق هست

"ইবলীসের রোগ انا خير (আমি উত্তম) অর্থাৎ, অহঙ্কার খুবই মারাত্মক। এই রোগ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইবলীস্ আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়ার মূল কারণ ছিল অহঙ্কার। বস্তুত এই রোগ হইতে কোন মানুষই মুক্ত নহে। যদিও ইবলীসের পর্যায়ের

নহে। কিন্তু শহরে আগুন লাগিলে ইহার আরম্ভ সামান্য বিষয় হইতেই হয়। একটি ম্যাচের কাঠিতেও কোন সময় গৃহে আগুন ধরিয়া যায়। কোন সময় সামান্য একটি অগ্নিকণা দ্বারাই বিরাট খড়ের ঘর ভস্ম হইয়া যায়। ইহা হইতে দালানেও আগুন লাগে। অতঃপর বায়ু আশেপাশের সমস্ত ঘরে আগুন পৌঁছাইয়া দেয়। এইরূপে সম্পূর্ণ বস্তি ঐ সামান্য অগ্নিকণার কারণেই পুড়িয়া ছারখার হয়।

দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়া অনুরাগের পার্থক্য ঃ বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম হইতে কুফরীর কারণ জানিতে পারিয়াছেন। ইহাকে হাল্‌কা মনে করিবেন না। ইহার সর্বনিম্নস্তর হইতেও আত্মরক্ষার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করুন। আমি দুনিয়া উপার্জনে আপনাদিগকে নিষেধ করিতেছি না; বরং দুনিয়ার প্রতি অনুরক্ত হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা, ইহাই যাবতীয় গুনাহের মূল। হাদীস শরীফে আছে ঃ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ “দুনিয়ানুরাগ সকল গুনাহ্‌র মূল।” আজকালকার নব্য-শিক্ষিতের দল দুনিয়া উপার্জন এবং দুনিয়ার মোহের মধ্যে পার্থক্য করে না। এই কারণে তাহারা দুইটি ভুলের মধ্যে পতিত রহিয়াছে।

প্রথমত, আলেমদের উক্তিতে দুনিয়ার নিন্দাবাদ দেখিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে যে, ইঁহারা দুনিয়া উপার্জনে নিষেধ করিতেছে। অথচ শরীঅতের দলিলে ইহার পরিষ্কার অনুমতি রহিয়াছে। আলেমগণ কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারেন?

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়া উপার্জনের স্বপক্ষে যে সমস্ত দলিল রহিয়াছে, এই বোকারা তৎসমুদয়কে দুনিয়ার প্রতি অনুরাগের স্বপক্ষে ব্যবহার করিতেছে। অথচ كَسْبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ فَرِيْضَةٍ “(শরীঅতের) ফরযসমূহের পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয” যে রাসূলের বাণী, তাঁহারই বাণী حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِيَ رَضِيَ
وَاِنْ مُنِعَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ ○

এই হাদীসে হুযূর (দঃ) বদ্‌দোআ করিয়াছেন ঃ “দীনার, দেরহাম এবং ক্ষুণ্ণিবৃত্তির দাস ধ্বংস হউক, লাঞ্ছিত হউক। তাহার কাঁটা বিঁধিলে খোদা করুন, খুলিয়া ফেলা ভাগ্যে না হয়।” কোন চিন্তাশীল এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন ঃ হুযূরের বদ্‌দোআও দোআরূপেই গৃহীত হয়, তবে ইহার ভয় কি? কেননা, হুযূর (দঃ) স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَيُّمَا رَجُلٍ اٰذَيْتُهٗ اَوْ شَتَمْتُهٗ اَوْ لَعَنْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلٰوةً
وَّ زَكٰوةً وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَا اِلَيْكَ ○

“হে খোদা! আমি মানুষ। আমি যেকোন মানুষকে কষ্ট দেই, গালি দেই কিংবা অভিশাপ দেই, আপনি উহাকে তাহার জন্য রহমত, পবিত্রকরণ এবং এবাদত বলিয়া গণ্য করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে আপনার নিকটবর্তী করিয়া নিন্‌।”

ইহার উত্তর এই হইবে যে, হুযূরের এই প্রার্থনা সেই বদ্‌দোআ সম্বন্ধে, যাহা হুযূর (দঃ) মানবসুলভ স্বভাবে ক্রোধপরবশ হইয়া করেন, শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ সম্বন্ধে এই প্রার্থনা নহে। এখানে দীনার এবং দেরহামের দাসকে যে বদ্‌দোআ করিয়াছেন তাহা মানবসুলভ স্বভাবের কারণে নহে; বরং তাহা শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ। এতটুকু বুঝিয়া লওয়ার পর এখন হুযূরের এই বদ্‌দোআকে খুব ভয় করা উচিত। কেননা, হুযূরের দো'আ এবং শরীঅতসম্মত বদ্‌দোআ খুব দ্রুত

কবূল হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ اِنِّىْ اَرٰى رَبَّكَ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ "আমি দেখিতেছি, আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, আপনার প্রভু তাড়াতাড়ি তাহা পূর্ণ করেন।"

এখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হইতে দুনিয়ানুরাগের স্বরূপ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি। কেননা, এ সম্বন্ধে অনেক মানুষ ভুল করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَـاؤُكُمْ وَاَبْنَـاؤُكُمْ وَاِخْـوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْـرَتُكُمْ وَاَمْـوَالُ نِ اقْتَـرَفْتُمُـوْهَـا وَتِجَـارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط

দুনিয়ার মহব্বত এবং লালসার স্তরঃ সোব্‌হানাল্লাহ্! আল্লাহ্ কেমন দয়ালু! তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মহব্বত আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত অপেক্ষা অধিক যেন না হয়। ইহার লক্ষণ এই যে, দুনিয়ার মোহে আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা ও পরিশ্রমে ত্রুটি আসিয়া যায়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলী পালনে যেন ত্রুটি হইতে না থাকে। আমার মতে, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় পরিশ্রম ও চেষ্টা" পদটি পূর্ববর্তী শব্দের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইহাতে আল্লাহ্ ও রাসূল অপেক্ষা দুনিয়া অধিক প্রিয় হওয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ অধিক প্রিয় হওয়া সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে। দুনিয়ার মহব্বত যদি স্বভাবগত হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে; বরং জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিয়া যদি দুনিয়াকে মহব্বত করা হয়, তাহা নিন্দনীয়। কেননা, জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে আল্লাহ্ এবং রাসূলই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়া উচিত। ইহার মাপকাঠি এই—দুনিয়াকে ভালবাসিয়াও যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্‌কাম পালনে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা ও পরিশ্রমে কোন ত্রুটি না হয়, তবে আল্লাহ্ ও রাসূলই অধিক প্রিয় বলিয়া বুঝাইবে। এই মাপকাঠি ঠিক থাকিলে দুনিয়া, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদির প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা অতিরিক্ত মাত্রায় হইলেও কোন ভয়ের কারণ নাই।

যদি কেহ তাহার পুত্রবিয়োগে অতিরিক্ত বিলাপ করে এবং হুযূর (দঃ)-এর এন্তেকালের ঘটনা শ্রবণ করিয়া না কাঁদে, তবে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। কিন্তু দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থের প্রতিঘাতের ক্ষেত্রে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দান করিলে অবশ্যই জবাবদিহি করিতে হইবে। ইহা না করিয়া যদি দুনিয়ার লোভ-লালসাকে ধর্মের খাতিরে বলি দেওয়া হয়—যদিও দুনিয়া ত্যাগের জন্য মনে দুঃখ-কষ্ট থাকে, তবে জবাবদিহি করিতে তো হইবেই না; বরং ইহাতে আরও সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত অন্তরে দুনিয়ার স্বাভাবিক মহব্বত এবং লালসা থাকা সত্ত্বেও ইহার বিরোধিতা করাই পূর্ণ পরহেযগারী। মাওলানা রূমী (রঃ) বলেনঃ

شهوت دنيا مثـال گلخن ست ـ كه ازو حمام تقوى روشن ست

"দুনিয়ার কামনা-বাসনার দৃষ্টান্ত—যেমন, ধোপার ভাট্টি, তদ্দ্বারা পরহেযগারীর হাম্মামখানা উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত হয়।"

ফেরেশ্‌তাগণ ঘুষ গ্রহণ না করিলে তাহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই। স্বভাবত তাহাদের মধ্যে ধন-দৌলতের লালসাই নাই। বাহাদুরী বলিতে গেলে ঐ সাব-জজের ঘটনা উল্লেখযোগ্য, যাহার নিকট বাদী-বিবাদী উভয়েই সোয়া দুই লক্ষ টাকা ঘুষ পেশ করে। কিন্তু তিনি তাহা হইতে এক

পয়সাও গ্রহণ করেন নাই ; বরং ক্রোধান্বিত হইয়া উভয়কে বাহির করিয়া দেন। অবশ্য মূর্খতাবশত উভয়ের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া এমন অন্যায় বিচার করিলেন, যাহাতে যালেম-মযলুম উভয়ের উপরই অবিচার হইয়া গেল এবং তিনি এরূপ করিবেন বলিয়া উভয়কে প্রথমে বলিয়াও দেন যে, তোমরা ঘুষ দিবার চেষ্টা না করিলে আমি ন্যায়বিচার করিতাম। কিন্তু যেহেতু তোমরা উভয়ে ঘুষ দিবার চেষ্টা করিয়া আমার মনে কষ্ট দিয়াছ, তাই আমি এমন মীমাংসা করিব, যাহাতে উভয়ের স্মরণ থাকে। ইহা অবশ্যই তাঁহার মূর্খতার পরিচায়ক। কিন্তু সোয়া দুই লক্ষ টাকা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করা সত্যই তাঁহার সৎ সাহসের পরিচায়ক এবং প্রশংসনীয়। তিনি তাহা গ্রহণ করিলে কোন অসুবিধা ছিল না। কেননা, একপক্ষ ঘুষ দিলে এবং অপরপক্ষ না দিলে ঘুষের ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ার আশঙ্কা ছিল। উভয়পক্ষ যখন ঘুষ দিতেছিল তখন প্রকাশ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তৃতীয় কেহ সংবাদ দিলেও প্রমাণ করিতে পারিত না। কেননা, রসিদ দিয়া ঘুষ লওয়া হয় না।

এসম্বন্ধে মাওলানা গাউস আলী পানিপথী ছাহেবের একটি মজার গল্প আমার মনে পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি তাঁহার ভাইয়ের মাধ্যমে মাওলানার নিকট ১০ টাকা হাদিয়া প্রেরণ করিয়াছিল। সম্ভবত ভাইয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। কাজেই বলিয়া দিয়াছিল, রসিদ লইয়া আসিবে। সে মাওলানার হাতে টাকা দিয়া বলিল ঃ ইহার রসিদ লিখিয়া দিন। মাওলানা বলিলেন ঃ “টাকা ফেরত লইয়া যাও, ঘুষের টাকারও কখন রসিদ হয় ?” সে বলিল, “হযরত ! ইহা ঘুষ কিরূপে হইল ? ইহা তো হাদিয়া।” তিনি বলিলেন ঃ বিনাস্বার্থে কে কাহাকে দান করে ? তোমরা আমাদের শুধু এই উদ্দেশ্যে দান কর যে, তোমাদের পার্থিব প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট কিছু সুপারিশ করিব। ইহা হাদিয়া হইল, না ঘুষ ? ইহাতে কৌতুক তো ছিলই, তৎসঙ্গে ইহাও শিখাইয়া দিলেন যে, যে দানে শুধু গ্রহীতার সন্তোষ ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না থাকে, কেবল তাহাই হাদিয়া।

আমি বলিতেছিলাম—শুধু দুনিয়ার লালসা নিন্দনীয় নহে ; বরং সেই লালসা অনুযায়ী আমল করা নিন্দনীয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন পীর ইহাতে ভুল করিবেন। তাঁহার নিকট কেহ দুনিয়ার লালসার অভিযোগ করিলে তিনি কোন ওযীফা কিংবা মোরাকাবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী পীর তাহাকে তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনা দিয়া বলিবেন ঃ দুনিয়ার লালসা হওয়া নিন্দনীয় নহে ; বরং সেই লালসার বিপরীত কার্য করিতে পারিলে সওয়াব অধিক হইবে ; বরং তখন শরীঅতের দৃষ্টিতে সেই লোভ, লোভ বলিয়াই গণ্য হইবে না, যাহার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয় না। শরীঅত সেই লোভকেই লোভ আখ্যা দেয়—যাহার ফলে ধর্মের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য হইতে থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) লোভের স্বরূপ খুব পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। পারস্য সম্রাটের ধন-ভাণ্ডারসমূহ বিজিত হইয়া খলীফার দরবারে আসিলে দেখা গেল, বিরাট ধন-ভাণ্ডার। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, উহা সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন রাজ্য। প্রথম হইতে একই বংশ পরম্পরায় শাসিত। কাজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, এত পুরাতন একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ধন-ভাণ্ডার কত বিরাট হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) তাহা দেখিয়া দো'আ করিলেন ঃ হে খোদা ! আমরা এমন প্রার্থনা করি না যে, ধনের প্রতি আমাদের আদৌ অনুরাগই না হউক এবং এই প্রার্থনাও করি না যে, ধনের আগমনে আমাদের মনে আনন্দ না হউক। কেননা, আপনিই বলিয়াছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط

"সুশোভিত করা হইয়াছে মানুষের জন্য শোভনীয় বস্তুর প্রেম—যেমন, রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য·····" অর্থাৎ, আপনিই যখন ইহাকে আমাদের জন্য সুশোভিত ও লোভনীয় বানাইয়াছেন, তখন ইহার প্রতি আমাদের অনুরাগও হইবে এবং ইহার সমাগমে আনন্দও হইবে ; বরং আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি, ইহার প্রতি আমাদের মহব্বতকে আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায় করিয়া দিন।

হযরত ওমর (রাঃ) যাহা বলিলেন, বাস্তবিকপক্ষে ইহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞানহীন পীর ; বরং তত্ত্বজ্ঞানীও এরূপ মনে করিবেন যে, ধন-সম্পদ সকল অবস্থায় নিন্দনীয় ; আর কতক মূর্খ লোক তো বড়াই করিয়া বলে, আমাদের কোন পরোয়া নাই। রাজত্বেরও পরোয়া করি না, টাকা-পয়সারও পরোয়া করি না। কেহ কেহ তো বেহেশ্ত হইতেও নিজের বেপরোয়াভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বেপরওয়াভাব ততক্ষণ পর্যন্ত টিকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল-ভাতের ব্যবস্থা আছে। অন্যথায় এসমস্ত দাবীর স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান তাহাই যাহা হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন। ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও প্রকাশ করিয়াছেন। ধনের সমাগমে আনন্দও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে এই প্রার্থনাও করিয়াছেনঃ 'হে আল্লাহ্! ইহার মহব্বতকে আপনার সন্তুষ্টি লাভের উপায় বানাইয়া দিন।'

অতএব, ধনের মহব্বত সকল অবস্থায় নিন্দনীয় নহে ; বরং এক পর্যায়ে তাহা কাম্য এবং প্রার্থনীয়ও বটে। যেমন, এতটুকু মহব্বত কাম্য যাহাতে ধনের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা, মাল নষ্ট করা হারাম। এতটুকু মহব্বতও যদি না থাকে, তবে মালকে বৃথা অপচয় করা হইবে এবং ধ্বংস ও বিনাশ করিয়া দিবে। অথচ হাদীসে ইহা নিষেধ করা হইয়াছে। যেমনঃ

اِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ○

এই কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেনঃ ধনের প্রতি মহব্বত আমরা অস্বীকার করি না। এই দাবীও করি না যে, ধনের সমাগমে আমাদের আনন্দ হয় না ; স্বাভাবিক মহব্বতও আছে এবং আনন্দও আছে। কিন্তু কার্যত এবং জ্ঞানত আমাদের এই প্রার্থনাঃ "ইহাকে আপনার সন্তুষ্টিজনক কার্যসমূহের উছিলা বানাইয়া দিন।"

রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের মাপকাঠিঃ উপরোক্ত বর্ণনায়—

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

হাদীসের মর্মও পরিষ্কার হইয়া গেল। অর্থাৎ, এখানেও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী রাসূল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়াই উদ্দেশ্য। ইহার বিস্তৃত বিবরণ جهاد فى سبيله -এর তফ্সীরে বর্ণিত হইয়াছে। সারমর্ম এই যে, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মহব্বত হুযূরের সহিতই সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। ইহার মাপকাঠি এই যে, যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালনে হুযূরের অনুসরণ করা এবং বিভিন্ন বিধান পরস্পর বিরোধী হইলে হুযূরের আদেশকে সমস্ত বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত কম হউক। অবশ্য চিন্তা করিলে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির স্বাভাবিক মহব্বত নিজের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের চেয়ে অধিকই আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানেই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জনৈক ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোক মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন ছাহেবের নিকট বলিল ঃ হযরত, আমার সন্দেহ হয়, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) অপেক্ষা আমার পিতার প্রতি আমার মহব্বত অধিক। মাওলানা তখন শুধু এতটুকু বলিলেন ঃ "হইতে পারে।" অতঃপর উক্ত সন্দেহের উত্তর কার্যত এইরূপে প্রদান করিলেন যে, কথায় কথায় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। উক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও খুব মত্ত হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন। কেননা, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। কোন যালেম যদি বলে যে, এই মুসলমান ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তবে তাহার অপেক্ষা মিথ্যাবাদী আর কেহ নাই। রাসূল (দঃ)-এর আলোচনা হইতেও কি কেহ নিষেধ করিতে পারে ? তবে হাঁ, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিষেধ করেন, যেন তাঁহার আলোচনা এরূপ না হয়, যাহাতে তাঁহার বিরোধিতা প্রকাশ পায়।

জনাব মাওলানা দেখিলেন যে, উক্ত রঈস্ ছাহেব খুব আনন্দের সহিত হুযূরের অবস্থা শ্রবণ করিতেছেন। অতএব, মধ্যস্থলে হঠাৎ বলিতে লাগিলেন ঃ আচ্ছা, এই আলোচনা বন্ধ করিয়া এখন আপনার পিতার কিছু গুণগান ও প্রশংসা করা হউক। কেননা, তিনিও একজন গুণশীল লোক ছিলেন। এই কথা শুনিতেই রঈস্ ছাহেবের চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং বলিল ঃ মাওলানা ! তওবা, হুযূর (দঃ)-এর সম্মুখে আমার পিতার কি অস্তিত্ব আছে যে, তাঁহার আলোচনা করার জন্য হুযূর (দঃ)-এর আলোচনা বন্ধ করা হইবে ? না, তাহা কখনও হইতে পারে না। আপনি হুযূর (দঃ)-এর বর্ণনাই করিতে থাকুন। তখন মাওলানা ছাহেব বলিলেন ঃ হুযূরের আলোচনার মধ্যস্থলে আপনার পিতার আলোচনা আপনার নিকট অপছন্দনীয় কেন হইল ? আপনি তো বলিতেন ঃ "আমার মনে হুযূর (দঃ)-এর চেয়ে আমার পিতার প্রতি অধিক মহব্বত অনুভব করিতেছি।" রঈস্ ছাহেব তখন তুলনামূলক চিন্তা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন ঃ মাওলানা ! আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আজ আমার একটি বড় সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। বাস্তবিকপক্ষে হুযূরের সহিতই আমার মহব্বত অধিক। তৎতুলনায় পিতার সহিত আমার কিছুমাত্র মহব্বত নাই বলিলেও চলে।

যাহাহউক, স্বাভাবিক মহব্বতও প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে হুযূরের জন্যই বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, স্বাভাবিক মহব্বত কম হইলেও ক্ষতি নাই। জ্ঞানানুগ মহব্বত হুযূরের জন্যই সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। কেননা, তাহা ভিন্ন শুধু স্বাভাবিক মহব্বত যথেষ্ট নহে। যেমন, কোন কোন লোক স্বভাবত হুযূরের সহিত যথেষ্ট মহব্বত রাখে। হুযূরের প্রশংসাসূচক 'কাসীদা' পাঠ করে। মৌলুদ শরীফের অনুষ্ঠান করে। হুযূরের নামে এবং আলোচনায় বেশ স্বাদও পায়। কিন্তু বিবেকসম্মত মহব্বত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—হুযূরের আদেশের বিরোধিতা করে। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা ভাল নহে। তাহার অবস্থার সংশোধন হওয়া উচিত।

আবার কোন কোন মানুষ বিবেকানুযায়ী হুযূরকে ভালবাসে, অর্থাৎ, তাঁহার আদেশাবলীর বিরোধিতা করে না। কিন্তু নিজের অন্তরে তাহারা হুযূরের প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত কম বলিয়া অনুভব করেন এবং তজ্জন্য বেশ অস্থিরও হন। আমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছি যে, প্রথমত তাঁহাদের মধ্যে স্বাভাবিক মহব্বতও আছে। অন্যথায় ইহার অভাব অনুভব করিয়া চিন্তিত হইতেন না। স্বাভাবিক মহব্বত না থাকার ধারণা এই কারণে হয় যে, এখনও অন্যান্য মহব্বতের সহিত